অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

বনি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. বাবুরাম গাঙ্গুলি খুব মেধাবী 2
২. গদাইবাবুর একদিন হঠাৎ মনে হল 26
৩. প্যান অ্যাম-এর একটি বোয়িং ৭৪৭ 41
৪. বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে 51
৫. সায়েন্স দিয়ে সবকিছুকে ব্যাখ্যা 85
৬. চার দিন বাদে মুখে দুশ্চিন্তা 98

১. বাবুরাম গাঙ্গুলি খুব মেধাবী

বাবুরাম গাঙ্গুলি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এনজিনিয়ারিং পাশ। করে আরও পড়াশুনার জন্য তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং উচ্চশিক্ষার পর সেখানেই খুব ভাল চাকরি পেয়ে থেকে গেলেন।

বাবুরাম গাঙ্গুলির অবস্থা খুবই ভাল। বহু টাকা রোজগার করেন। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে তিনি থাকেন স্ত্রী প্রতিভার সঙ্গে। বিশাল বাড়ি, তিনটে দামি গাড়ি আছে তাঁদের। একটা বাবুরামের, একটা প্রতিভার আর একটা স্ট্যান্ডবাই।

বাবুরামের সবই আছে। কিন্তু দুঃখ একটিই। বিয়ের দশ বছর পরেও তাঁদের কোনও সন্তান হয়নি। সন্তান না থাকলে মানুষের কাছে গাড়ি বাড়ি টাকা-পয়সা সবই অর্থহীন হয়ে যায়। বাবুরাম আর প্রতিভার কাছেও জীবনটা ভারী অর্থহীন হয়ে উঠছিল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

বাবুরাম আর প্রতিভা উইক এন্ডে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাঁরা যাবেন পেনসিলভানিয়ার পোকোনো জলপ্রপাত দেখতে। সকালবেলা। আশি নম্বর হাইওয়ে ধরে বাবুরাম গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে বসে প্রতিভা ম্যাপ দেখে রাস্তা ঠিক করছেন। ডেলাওয়ার ওয়াটার গ্যাপের কাছবরাবর যখন চলে এসেছেন তাঁরা তখন হঠাৎ বাবুরাম ভারী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ পাশের লেন দিয়ে একটা মস্ত গাড়ি তাঁর গাড়িকে পেরিয়ে যাচ্ছিল,সেই গাড়িতে অনেকগুলো বাচ্চার হাসিমুখ দেখতে পেয়েই বোধ হয় তাঁর নিজের শূন্য জীবনটার জন্য ফের দুঃখ হচ্ছিল। আর এই অন্যমনস্কতার মধ্যেই কিছু একটা ঘটে গেল। কী ঘটেছিল তা বাবুরাম জানেন না। পরে তাঁর মনে পড়েছিল, তিনি একটা প্রচণ্ড শব্দ

শুনতে পেয়েছিলেন, তারপরই গাড়িটা রাস্তার ধারে তীরবেগে উলটে পড়ে যাচ্ছিল। বাবুরাম জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলেন তিনি একটা ঘরে শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন, কিন্তু বিছানায় নয়, মেঝের ওপর। গায়ে হাতে পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে তিনি উঠে বসে দেখলেন, একটু দূরে মেঝের ওপর প্রতিভাও পড়ে আছে। বাবুরাম পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে, প্রতিভাও বেঁচে আছে। তাদের কারও আঘাতই খুব গুরুতর নয়।

গাড়ি দুর্ঘটনার কথা বাবুরামের মনে পড়ল, কিন্তু এই বাড়ির মধ্যে তাঁরা কী করে এলেন তা বুঝতে পারলেন না। বাড়িতে লোকজন বা আসবাবপত্র কিছুই নেই। পরিত্যক্ত বাড়ি। দেওয়ালে অনেক ফুটো, মেঝের তক্তা ভাঙা,। হাইওয়ে থেকে অনেকটা দূরেই এই বাড়ি। কেউ যদি তাদের তুলে এনে এখানে রেখে গিয়ে থাকে তো সে অদ্ভুত লোক। হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে এরকম একটা পোড়া বাড়িতে তাঁদের আনার মানে কী?

বাড়িতে একটা ছোট সুইমিং পুল ছিল। তা থেকে জল এনে প্রতিভার চোখে-মুখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরালেন বাবুরাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুজনে বেরোলেন। আশেপাশে লোকবসতি নেই। ঘন জঙ্গল। তবে একটা কাঁচা রাস্তা আছে।

প্রায় মাইল-দুই হেঁটে তবে তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন, গাড়িটি নেই। লোকজনও কেউ জমায়েত হয়নি সেখানে।

বাবুরাম হঠাৎ নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, সকাল ন'টা বাজে। দুর্ঘটনা ঘটেছে সকাল আটটা নাগাদ। এত তাড়াতাড়ি গাড়িটা সরাল কে? আমেরিকা কাজের দেশ বটে, কিন্তু তা বলে এত তাড়াতাড়ি তো এরকম হওয়ার কথা নয়।

হঠাৎ বাবুরামের চোখ গেল ঘড়ির তারিখের খোপে। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বারো তারিখ, সোমবার। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। আজ তো দশ তারিখ, শনিবার।

"প্রতিভা, তোমার ঘড়িটা দ্যাখো তো আজ কত তারিখ এবং কী। বার?"

প্রতিভাও ঘড়ি দেখে অবাক হয়ে বললেন, "ও মা, এ তো দেখছি সোমবার আর বারো তারিখ।"

"সেটা কী করে সম্ভব? আমরা কি দু'দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?"

"অসম্ভব।"

বাবুরাম খুবই চিন্তিত হলেন। দুদিন অজ্ঞান হয়ে থাকলে তাঁদের প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ার কথা। প্রচণ্ড খিদে-তেষ্টাও পাওয়ার কথা। কিন্তু ততটা দুর্বল তাঁরা বোধ করছেন না। তবে এমনও হতে পারে, দুর্ঘটনার ধাক্কায় তাঁদের ঘড়ি বেগড়বাই করছে।

দু'জনে আরও মাইল-দুই হেঁটে একটা গ্যাস স্টেশন পেলেন। অর্থাৎ পেট্রল পাম্প। সেখান থেকে একটা এজেন্সিতে ফোন করলেন একখানা গাড়ি পাঠাতে। রেস্টরুমে গিয়ে দু'জনেই হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে একটা করে কোকাকোলা খেলেন। গ্যাস স্টেশনের লোকটিকে আজ কত তারিখ তা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলেও বাবুরাম লজ্জা পাচ্ছিলেন। প্রশ্ন শুনলে লোকটা তাঁকে হাঁদা মনে করে হাসবে। কিন্তু পেট্রল পাম্পের সামনেই খবরের কাগজের স্লট মেশিন রয়েছে। বাবুরাম পয়সা ঢুকিয়ে একখানা খবরের কাগজ বের করে দেখলেন। যা দেখলেন তা অবিশ্বাস্য। আজ যথার্থই বারো তারিখ। বারোই সেপ্টেম্বর। সোমবার।

প্রতিভাকে আড়ালে ডেকে বাবুরাম বললেন, "আমরা যে দু'দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আজ বারোই সেপ্টেম্বর। কিন্তু আমরা এমন কিছু চোট তো পাইনি যাতে দু'দিন অজ্ঞান হয়ে থাকার কথা।"

প্রতিভা অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন, "শুধু তাই নয়। আমাদের দুজনকে দু'মাইল দূরে ওই পোড়ড়া বাড়িতেই বা নিয়ে গেল কে? কেনইবা নিল?"

বাবরাম খুবই চিন্তিত হলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একখানা গাড়ি এসে গেল। প্রতিভা আর বাবরাম তাঁদের বাড়িতে ফিরে এলেন।

তাঁরা ফিরে আসবার পর প্রতিবেশী মাগারেট নামে একটি মেয়ে এসে খুব অবাক গলায় বলল, "তোমরা কোথায় ছিলে? পুলিশ-স্টেশন থেকে নোক এসে তোমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর করে গেছে। তোমরা নাকি গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছ? গাড়িটা একদম স্ম্যাশড হয়ে গেছে। অথচ তোমাদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

এসব প্রশ্নের সদুত্তর বাবুরামের জানা নেই। তিনি চুপ করে রইলেন।

তারপর ধীরে-ধীরে ঘটনাটার কথা কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের স্মৃতিতে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। আমেরিকায় কাজের লোকদের বিশ্রাম বলে কিছু নেই। প্রতিভাও চাকরি করেন। হাড়ভাঙা খাটুনি, দোকানবাজার করা, ঘরদোর গোছানো, রান্নাবান্না, কাপড়কাঁচা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে মানুষের আর অলস চিন্তার সময় থাকে না। সুতরাং ঘটনাটা নিয়ে তাঁরা বেশি মাথা ঘামানোর সময় পেলেন না।

এই ঘটনার ঠিক এগারো মাস বাদে তাঁদের প্রথম সন্তান জন্মাল। একটি ছেলে।

কিন্তু ছেলেটি জন্মানোর পরই দেখা গেল, তার হাত-পা অসাড় এবং স্থির। কান্নাকাটি তো দূরের কথা, কোনও শব্দই করল না

বাচ্চাটা জন্মের পর। ডাক্তাররা প্রথম তাকে মৃত বলে মনে করেছিলেন। জীবনের লক্ষণ দেখে তাকে রেখে দেওয়া হল একটি অক্সিজেন টেন্টের ভিতরে।

বাবুরামকে ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার ছেলেটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি বাঁচে তবে বাঁচবে উদ্ভিদের মতন। নড়াচড়া করতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না। চিরকাল ওকে। তোমাদের খাইয়ে দিতে হবে, টয়লেট করাতে হবে।"

বাবুরামের চোখে জল এল। এতদিন পরে যদিও-বা সন্তান হল তাও জড়পদার্থ বিশেষ।

ডাক্তার ক্ষীণ ভরসা দিয়ে বললেন, "নিউ ইয়র্কে ডাক্তার ক্রিলের কাছে একবার নিয়ে যেও। উনি বিশ্ববিখ্যাত নিউরোসার্জেন। যদি কিছু পারেন উনিই পারবেন। তবে আপাতত আমরা মাসখানেক বাচ্চাটিকে অবজারভেশনে রাখব।

নিউ ইয়র্কের মস্ত এক হাসপাতালের নিউরোলজির সর্বেসর্বা ডাক্তার ক্রিল। জেমস ক্রিলের খ্যাতি সত্যিই বিশ্বজোড়া।

ডাক্তার ক্রিল বাবুরামের বাচ্চাটাকে দেখলেন। নানারকম পরীক্ষা করে বললেন, "এর জড়তার কারণ আমরা ঠিক ধরতে পারছি না। মস্তিষ্কে কোন একটা অবস্ট্রাকশন আছে। আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন দরকার।"

ডাক্তার জেমস ক্রিলের হাসপাতালে বনি অর্থাৎ বাবুরামের ছেলেকে ভর্তি করে দেওয়া হল।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। অবশেষে ক্রিল বললেন, "অপারেশন ছাড়া কোনও উপায় দেখছি না।"

অপারেশনের নামে ভয় পেলেন বাবুরাম আর প্রতিভা। তাঁদের অনেক আকাঙক্ষার ধন ওই বনি। ওইটুকু তো ছেলে, সে কি মাথার অস্ত্রোপচার সহ্য করতে পারবে?"

ক্রিলকে সে কথা বলতে তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, "আপনার ছেলেকে আমি সবরকমভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। তার হার্ট, লাংস চমৎকার। অপারেশনের ধকল সে সহ্য করতে পারবে বলেই মনে হয়।"

বাবুরাম আর প্রতিভা চোখের জল ফেলতে-ফেলতে হাসপাতালের কাছেই যে-হোটেলে তাঁরা এসে উঠেছেন সেখানে ফিরে এলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দু'জনেই মন-খারাপ করে বসে রইলেন।

ডাক্তার ক্রিল থাকেন সাউথ অফ ম্যানহাটানে। তাঁর বাড়িটি বিশাল।

অপারেশনের প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছেন ডাক্তার ক্রিল। আগামী কাল তিনি এই অদ্ভুত শিশুটির মস্তিষ্ক খুলে দেখবেন সেখানে গণ্ডগোলটা কিসের।

দোতলার বিশাল শয়নকক্ষে ডাক্তার জেমস ক্রিল একাই থাকেন। অন্যান্য ঘরে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। রাত দুটো নাগাদ এক, প্রবল অস্বস্তিতে ক্রিলের ঘুম ভাঙল। তিনি শুনতে পেলেন, খাটের পাশে তাঁর টেলিফোনটা বাজছে।

"হ্যালো।" একটা গম্ভীর ধাতব গলা বলল, "সুপ্রভাত, ডাক্তার ক্রিল। কাল সকালে একটি বাচ্চার ব্রেন অপারেশন করতে যাচ্ছ তুমি?"

"সেকথা ঠিক।"

"কোরো না, ও যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও, প্লিজ।"

"তুমি কে?"

"আমাকে চিনতে পারবে না।"

ফোন কেটে গেল। টেলিফোনে হুমকি বা ফাঁকা আওয়াজ ব্যাপারটা, নতুন বা অভিনব কিছু নয়। দুনিয়ায় নিষ্কমা, পাগল, বদমাস কত আছে। ক্রিল ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভোর চারটে নাগাদ ক্রিল তাঁর বুকে একটা চাপ অনুভব করলেন। তাঁর খুব ঘামও হচ্ছিল। তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়, তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন এবং স্বাস্থ্যও ভাল। এরকম হওয়ার কথা নয়। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। বাড়ির লোককে ডেকে তুলবেন না হাসপাতালে ফোন করবেন তা স্থির করতে একটু সময় গেল।

হঠাৎ আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো।"

এবারে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর। বেশ মোলায়েম গলা, "সুপ্রভাত, ডাক্তার ক্রিল। আশা করি তুমি বনির ওপর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত বদল করেছ!"

ডাক্তার ক্রিল,বললেন, "না তো! কিন্তু তোমরা কারা? কেন এই অপারেশন বন্ধ করতে চাও?"

"সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা চাই বাচ্চাটা যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও।"

"তাতে বাচ্চাটার ক্ষতিই হবে।"

"অপারেশন করলে তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তুমি মস্ত ডাক্তার বটে, কিন্তু তুমিও ভগবান নও। গত এক বছরে তোমার তিনজন রুগি অপারেশনের পর মারা গেছে। জার্সি সিটির, পি ডি আথারটন, কুইনসের মিসেস জে চেস্টারফিল্ড, বেকার্সফিল্ডের জন কোহেন।"

ক্রিল সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, "এটা কোন ধরনের রসিকতা? ডাক্তার তো ভগবান নয়ই।"

"সেজন্যই তোমাকে সাবধান করা হচ্ছে। তা ছাড়া বনির কী। হয়েছে তাও তুমি ভাল করে জানো না। তোমার অপারেশন হবে। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো।"

ক্রিল রেগে গিয়ে বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন বনির কী হয়েছে তা তোমরা আমার চেয়ে বেশি জানো!"

"কথাটা মিথ্যে নয় ডাক্তার ক্রিল। আমরা সত্যিই জানি। আর জানি বলেই বলছি, বাচ্চাটা যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও।"

“এভাবে বেঁচে থেকে ওর লাভ কী?”

“সেটা তুমি বুঝবে না।”

“তোমরা কারা?”

“আমরা বনির বা তোমার শত্রু নই। শোনো ডাক্তার ক্রিল, আমাদের সংগঠন অতিশয় শক্তিশালী। আমরা যা বলছি তা না শুনলে তোমার বিপদ হবে। এখন যে তুমি অসুস্থতা বোধ করছ তার কারণ জানো? তুমি অস্থির বোধ করছ, তোমার ঘাম হচ্ছে, বুকে একটা চাপ অনুভব করছ-তাই না?”

ডাক্তার ক্রিল হাঁফধরা গলায় বললেন, “হ্যাঁ। তোমরা কী করেছ আমাকে? খাবারে বিষ মিশিয়েছ?”

“বিকেলে হাসপাতালে তুমি যে কফি খেয়েছিলে তাতে বিলম্বিত-ক্রিয়ার বিষ মেশানো ছিল। কাল সকালে তোমার অসুস্থতা আরও বাড়বে। বিষটা পৌঁছবে তোমার হৃৎপিণ্ডে। এই বিষের প্রতিষেধক তোমার জানা নেই।”

“আমি কি মারা যাব?”

“যাবে, যদি বনির ওপর অস্ত্রোপচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত না নাও।”

“যদি অস্ত্রোপচার না করি তা হলে?”

“যদি কথা দাও অস্ত্রোপচার করবে না তা হলে কাল সকালে হাসপাতালে এসে প্রথম যে কফিটা খাবে তাতে আমরা বিষের অ্যালিডোট মিশিয়ে দেব। তবে তোমার শরীর সকালে আরও খারাপ হবে। হাসপাতালে নিজে গাড়ি চালিয়ে এসো না। একটা ক্যাব বা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এসো। ভয় নেই, আমাদের কথা শুনে চললে তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না।”

ফোন কেটে গেল। ডাক্তার ক্রিল অবিশ্বাসের চোখে রিসিভারের দিকে চেয়ে রইলেন। বিশ্বাস হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাঁর শরীর যে খারাপ তা তো মিথ্যে নয়।

রাত পোহানোর জন্য ক্রিল অপেক্ষা করলেন না। একটা এজেন্সিতে টেলিফোন করলেন চালকসহ গাড়ির জন্য। তারপর পোশাক পরে নিলেন চটপট। মাঝে-মাঝেই তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করছেন, ঘাম হচ্ছে, বুকের চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

ক্রিল যখন হাসপাতালে পৌঁছলেন তখনও ভোর হতে অন্তত দু'ঘণ্টা বাকি। রাতের কর্মচারীরা অবশ্য তাঁকে দেখে অবাক হল না, ভাবল, কোনও গুরুতর রুগিকে দেখতে এসেছেন।

নিজের ঘরে গিয়েই তিনি কফি চেয়ে পাঠালেন ফোনে। তারপর নিঝঝুম হয়ে বসে ঘটনাটা বিচার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কফি এসে গেল। যে কফি আনল সে পুরনো লোক। গত দু' বছর ধরে এ কাজ করছে।

ওরা বলেছিল প্রথম কাপ কফিতেই অ্যালিডোট মেশানো থাকবে। আছে কি? ভ্রু কুঁচকে ভাবতে-ভাবতে তিনি কফিতে চুমুক দিলেন।

কফি শেষ করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার ক্রিল বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শরীরে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি অনেক ঝরঝরে এবং সুস্থ বোধ করছেন।

তিনি ধীরে-ধীরে বনির ঘরে এসে তার ছোট্ট বিছানাটার পাশে দাঁড়িয়ে শিশুটির দিকে নিস্পলক চেয়ে রইলেন। এই শিশুটিকে ঘিরে কোন রহস্য দানা বেঁধে উঠছে? কেন কিছু লোক চাইছে বনির চিকিৎসা বন্ধ করতে?

বনি ঘুমোচ্ছে। চোখ বোজা। জেগে থাকলেও বনি কোনও শব্দ করে না। কাঁদে না, হাসেও না। কেবল চুপ করে চেয়ে থাকে। এই কাঠের পুতুলের মতো বাচ্চাটি সম্পর্কে কার এত আগ্রহ?

হঠাৎ ডাক্তার ক্রিল লক্ষ করলেন, বনি চোখ চেয়ে সোজা তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। সোজা তার চোখের দিকে। ডাক্তার ক্রিল একটু ঝুঁকে বনির দিকে চেয়ে রইলেন। খুব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে লাগলেন শিশুটিকে। তাঁর কেমন যেন মনে হল, বনি সম্পর্কে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে কোনও ভুল আছে। আজ তিনি বনির চোখ দেখে। বুঝতে পারলেন, এই শিশুটির আর সব অসাড় হলেও, মস্তিষ্ক অসাড় নয়। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটি ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের প্রতিফলন রয়েছে। বনি আর যাই হোক, বোধহীন শিশু নয়।

বনির বাবা-মা সকালবেলায় যখন হাসপাতালে এল তখন ক্রিল তাঁর চেয়ারে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চন।

বাবুরাম আর প্রতিভাকে আনমনেই অভ্যর্থনা জানালেন ক্রিল। তারপর ম্লান মুখে বললেন, “দুঃখিত, কোনও বিশেষ কারণে বনির অপারেশন করা সম্ভব নয়।”

বাবুরাম অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, “কেন?”

“কারণটা অত্যন্ত জটিল। মেডিক্যাল টার্মস আপনারা ভাল বুঝবেন না। তবে অপারেশনটা বনির পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। আমার মনে হয়, বনি এখন যেমন আছে তেমনই থাক।”

“কিন্তু.... ”

ক্রিল একটু চাপা স্বরে বললেন, “কোনও কিন্তু নেই। বনির অপারেশন হচ্ছে না। আমি ওকে আরও কয়েকদিন অবজার্ভেশনে রেখে ছেড়ে দেব।”

অপারেশন হবে না শুনে প্রতিভা কিন্তু খুশিই। তিনি স্বামীকে বললেন, "শোনো, বনি যদি বেঁচে থাকে তা হলেই আমাদের ঢের।

আমি আর কিছু চাই না।"

বাবুরাম হতাশ গলায় বললেন, "কিন্তু এ তো ঠিক বেঁচে থাকা নয়। ওকে কে দেখবে আমাদের মৃত্যুর পর?"

প্রতিভা বললেন, "আমাদের মরতে এখনও ঢের দেরি। ততদিনে একটা কিছু হয়ে যাবেই।"

বাবুরাম ডাক্তার ক্রিলের দিকে চেয়ে বললেন, "আমরা কবে বনিকে নিতে আসব?"

ডাক্তার ক্রিল মাথা নেড়ে বললেন, "বলতে পারছি না। খুব বেশি হলে তিন-চারদিন।"

স্বামী-স্ত্রী বিদায় নিলে ডাক্তার ক্রিল আরও কিছুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন রইলেন। তারপর রুগি দেখতে উঠতে হল।

বাবুরাম ও প্রতিভা সারাদিনই বনিকে নিয়েই কথা বলেন এবং বনিকে নিয়েই চিন্তা করেন। বিশেষ করে বনির ভবিষ্যৎ। এই নিষ্ঠুর উদাসীন পৃথিবীতে বনির মত অসহায় শিশুর কী দশা হবে? কে। দেখবে ওকে? ও কি কোনওদিন হাঁটতে, চলতে বা কথা বলতে পারবে?

প্রতিভা ও বাবুরাম রোজই হাসপাতালে যান। বনিকে দেখে আসেন। তিনদিন বাদে ডাক্তার ক্রিল বললেন, "বনির অবজারভেশন শেষ হয়েছে। এবার ওকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন।"

বাবুরাম অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "অবজারভেশনে কী পেলেন?"

ক্রিল খানিকক্ষণ বাবুরামের মুখের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, "আমার মনে হয় বনি নির্বোধ নয়।"

"তার মানে কী ডাক্তার?"

"আমাদের যন্ত্রপাতি এবং কম্পিউটার বলছে, বনির মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল। তার হাত-পা-জিভ অসাড় হলেও তার মাথা নয়।"

"ও কি ভাল হবে?"

"তা বলা কঠিন। ভাল-মন্দ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সাবেক কালের। হয়তো এ-সব ধারণা ভবিষ্যতে পালটাতে হবে।"

"এ-কথার অর্থ কী?"

"এর চেয়ে বেশি বলা আপাতত সম্ভব নয়।"

বাবুরাম জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িতে ওর চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা কি করে দেবেন?"

ক্রিল মাথা নেড়ে বললেন, "কোনও চিকিৎসা নয়। শুধু লক্ষ। রাখবেন। আর-একটা কথা। যদি পারেন বনিকে নিয়ে খুব দূরে কোথাও চলে যাবেন। কোনও নিরাপদ জায়গায়।"

"এ-কথার মানে কী ডাক্তার ক্রিল?"

"আমার মনে হয় আমেরিকা বনির পক্ষে খুব নিরাপদ জায়গা নয়।"

অনেক ঝুলোঝুলি করেও ডাক্তার ক্রিলের কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু বোঝা গেল না। বাবুরাম ও প্রতিভা বনিকে নিয়ে তাঁদের নিউ জার্সির বাড়িতে ফিরে এলেন।

নিউ জার্সি খুব ছোট শহর নয়। কিন্তু আমেরিকার এসব শহর খুব নির্জন। রাস্তায় লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। মাঠ, পার্ক, অরণ্য, খেলার মাঠ সবই আছে, কিন্তু বড় নিরিবিলি।

এ-দেশে কারও বাড়িতেই বেশি লোজন থাকে না, যৌথ পরিবার নেই। এক-একটা বাড়িতে কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রী আর একটা-দুটো বাচ্চা থাকে। যে যার আপনমনে থাকে, এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াত বা গল্পগুজব করার সময় কারও নেই। এ হল কাজের দেশ। ফলে অধিকাংশ বাড়িই সকালবেলা থেকেই ফাঁকা হয়ে যায়।

বাবুরামের বাড়িটাও এইরকম নির্জন এক পাড়ায়। চারদিকে লম্বা-লম্বা গাছে ছাওয়া ভারী সুন্দর বাড়ি। এ-দেশে বাড়ির সামনে এবং পিছনে লন বা ঘাসজমি রাখতেই হয়। সব বাড়িরই মাটির তলায় একটা করে প্রশস্ত ঘর থাকে, তাকে বলে বেসমেন্ট। একতলায় সাধারণত বৈঠকখানা, লিভিংরুম, রান্না আর খাওয়ার ঘর থাকে। ওপরতলায় শোওয়ার ঘর। বাবুরাম সকাল সাতটার মধ্যেই বেরিয়ে যান। সারাদিন বাড়িতে প্রতিভা ছেলে বনিকে আগলে নিয়ে থাকেন। বনিকে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। জেগে থাকলে সে চেঁচায় না বা কাঁদে না। শুধু চেয়ে থাকে। যখন ঘুমোয় তখন চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ছাড়া বনির শরীরে আর কোনও কিছুই নড়ে না। তবে বনি খায়। দুধ, ফলের রস খেতে সে খুব ভালবাসে, এটা প্রতিভা বুঝতে পারেন। বনির স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভালই।

প্রতিদিন সকালে ঘরের যত আবর্জনা, তরকারির খোসা বা এটোকাঁটা একটা প্লাস্টিকের থলিতে করে নিয়ে বাড়ির সামনে রেখে দিতে হয়। গারবেজের গাড়ি এসে সেটা নিয়ে যায়। একদিন সকালে প্রতিভা গারবেজ ব্যাগ রাখতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন, রাস্তার ও-পাশে একটা পপলার গাছের নীচে একজন ভবঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকেই লক্ষ করছে। লোকটার মাথায় একটা তোবড়ানো টুপি, চুল-দাড়ি-গোঁফে মুখটা আচ্ছন্ন, গায়ে ময়লা কোট, পরনে প্লিমারা ট্রাউজার্স, পায়ে নোংরা বুটজুতো, গলায় বড়-বড় লাল পুঁতির একটা মালা আর কাঁধে একটা বেহালার বাক্স। বিচিত্র চেহারা এবং পোশাকের এইসব ভবঘুরেকে অবশ্য আমেরিকার সর্বত্রই দেখা যায়। এরা আবর্জনা ঘেঁটে খাবার বা পয়সা খোঁজে, ভিক্ষে করে, নেশাভাঙের পয়সা জোটাতে চুরি তো করেই, খুনখারাপিতেও পিছপা হয় না।

প্রতিভা অবশ্য ভয় পেলেন না। আমেরিকায় তিনি অনেকদিন আছেন। ভবঘুরেও বিস্তর দেখেছেন। কিন্তু লোকটা এমন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে যে, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

একটু বাদেই হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। এই অসময়ে কারও আসবার কথা নয়। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে এখানে কেউ কারও বাড়ি যায় না। তবে সেলসম্যান বা ডাকপিয়ন হতে পারে। কিন্তু তা হলে সামনে গাড়ি পার্ক করা থাকবে। এখানকার সেলসম্যান বা ডাকপিয়ন গাড়ি ছাড়া আসবে না। প্রতিভা দোতলার ঘর থেকে কাঁচের শার্শি দিয়ে উঁকি মেরে কোনও গাড়ি দেখতে পেলেন না। তবে লক্ষ করলেন, পপলার গাছের নীচে ভবঘুরেটা নেই।

প্রতিভার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। ভবঘুরেটাই কি ডোরবেল বাজাল? প্রতিভা অবশ্য এসব পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছেন। সুতরাং ঘাবড়ালেন না। তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে রান্নাঘরের টেবিল থেকে বড় তরকারি কাটার ছুরিটা হাতে নিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললেন। দরজায় চেন লাগানো, চট করে কেউ ঢুকতে পারবে না।

সেই ভবঘুরেটাই একগাল হাসি নিয়ে বলল, "সুপ্রভাত। আমি বড় ক্ষুধার্ত। কিছু দিতে পারেন?"

প্রতিভা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। লোকটার হাবভাব তাঁর ভাল লাগছে না। "দাঁড়াও।" বলে প্রতিভা দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন।

লোকটা তার পায়ের বুট দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা আটকাল।

চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। কেউ শুনতে পাবে না। সারা শহর এখন খাঁখাঁ জনশূন্য। প্রতিভা প্রাণপণে দরজাটা চেপে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। লোকটাও তেমন ঠেলাধাক্কা করল না, শুধু ভারী বুট দিয়ে দরজাটা আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রতিভা ছুরিটা শক্ত করে ধরে দরজার ফাঁক দিয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, "কী চাও?"

লোকটা একটু হেসে বলল, "এই তো কাজের কথা ম্যাডাম। গায়ের জোর দেখিয়ে লাভ নেই। আমি কিছু টাকা চাই। দশ-বিশ ডলার হলেই চলবে। আর কিছু খাবার। বাসী হলেও আপত্তি নেই।"

প্রতিভা আর কী করেন, মনে আতঙ্ক নিয়েই লোকটাকে তাড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে একটা আস্ত পাউরুটি, এক প্যাকেট মাখন, একটা পিচ আর একটা আপেল একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরলেন। পাঁচটা ডলার হাতে নিয়ে সদর দরজার দিকে আসতেই দেখলেন, লোকটা দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে পড়েছে এবং চারদিকে চেয়ে দেখছে। হাবভাব ভাল নয়।

প্রতিভা পিছিয়ে গিয়ে খাওয়ার টেবিল থেকে আবার ছুরিটা তুলে নিলেন তারপর এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার যথেষ্ট দুঃসাহস। কার হুকুমে তুমি ঘরে ঢুকেছ?

আমার কারও হুকুমের দরকার হয় না। ছুরিটা রেখে দাও, ওটা যদি ব্যবহার করার ইচ্ছে থাকে তা হলে সেটা ছেলেমানুষী হবে।

প্রতিভা কী করবেন ভেবে পেলেন না। খুব ভয় পেয়েছেন, কিন্তু কিছু করারও নেই। শুধু বললেন, "তুমি কী চাও? এই খাবার নাও, পাঁচটা ডলার দিচ্ছি, নিয়ে যাও। কিন্তু দয়া করে বিদেয় হও।"

লোকটা প্রতিভার কথায় কর্ণপাত করল বলে মনে হল না, পাত্তাও দিল না। শিস দিতে দিতে ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। বেশ বেপরোয়া ভাব। প্রতিভা চেষ্টা করলেও লোকটাকে ছুরি মারতে পারবেন না এটা তিনি ভাল জানেন। সুতরাং তিনি লোকটার দিকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইলেন শুধু।

লোকটা চারদিক দেখতে দেখতে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাচ্ছিল। প্রতিভা একটু ব্যবধান রেখে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। লোকটা ধীরেধীরে দোতলায় উঠল।

প্রতিভা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওখানে আমাদের শোওয়ার ঘর। কেন ওখানে যাচ্ছ?"

"শোওয়ার ঘরেই মানুষ মূল্যবান জিনিসগুলি রাখে।"

"প্লিজ! ও-ঘরে আমার ছেলে ঘুমোচ্ছে। সে অসুস্থ। শব্দ করলে জেগে যাবে।"

লোকটা প্রতিভাকে গ্রাহ্যই করল না। দোতলায় উঠে প্রতিভার শোওয়ার ঘরে ঢুকল। বনির নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রতিভা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ছেলেকে আগলে বসলেন।

লোকটা বনির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "তোমার ছেলে তত জেগেই আছে দেখছি।"

প্রতিভা দেখলেন সত্যিই বনির চোখ খোলা। সে তাকিয়ে আছে।

লোকটা হঠাৎ বলল, "তোমার ছেলের চোখের রং কি লাল? টকটকে লাল?"

"না। আমার ছেলের চোখের রং কালো।"

লোকটা হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে বলল, "ভাল করে দ্যাখো, তোমার ছেলের চোখের রং লাল। ঘোর লাল।"

প্রতিভা বনির দিকে চেয়ে এত অবাক হয়ে গেলেন যে, বলার নয়। বনির চোখের কালো মণিদুটো দুটি চুনি পাথরের মতো লাল আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এরকম অস্বাভাবিক চোখ প্রতিভা কখনও দেখেননি।

"ও মা! বনির কী হল!" বলে তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে জাপটে ধরলেন।

লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “সবুজ! ওর চোখের রং সবুজ হয়ে যাচ্ছে! এ তো ভূতড়ে ব্যাপার।

প্রতিভা বনির চোখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, চুনি নয়। দুটি চোখ পান্নার মতো সবুজ। চোখ থেকে যেন দ্যুতি ঠিকরে আসছে।

ভবঘুরেটার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে লোকটা পিছু হটে দরজার কাছে পৌঁছল। তারপর দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে পালিয়ে গেল। প্রতিভা জানালার দিকে দেখলেন, লোকটা রাস্তা ধরে ছুটছে।

প্রতিভা দেখলেন, বনির চোখের রং আবার কালো হয়ে গেছে।

প্রতিভা ঘাবড়ে গেছেন বটে, কিন্তু জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন, বাবুরামের ফেরার জন্য। বনির জন্য তাঁর এত দুশ্চিন্তা হল যে, সারাদিন তিনি বনিকে আর কোল-ছাড়া করলেন না। বনির কি চোখের দোষ আছে? বনির ওপর কি কোনও অপদেবতার ভর হয়? নইলে চোখের রং অমন অস্বাভাবিকভাবে পালটে যাবে কেন?

বিকেলে বাবুরাম ফিরে সব শুনলেন। টেলিফোন করে তক্ষুনি ডাক্তার ক্রিলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হল। পরদিন সকাল সাতটায় ক্রিল বনিকে দেখবেন। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

পরদিন হাসপাতালে শুধু ডাক্তার ক্রিল নয়, একজন চোখের ডাক্তারও বনিকে ভাল করে দেখলেন। তাঁরা মত দিলেন, বনির চোখে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। বনির চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক।

ক্রিল প্রতিভাকে ঘটনাটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন। তারপর চিন্তিতভাবে বললেন, “তুমি বলছ যে, বনির চোখের তারার রং পাল্টে যাচ্ছিল? আশ্চর্যের

বিষয় এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে আমি কেন যেন ঠিক অবিশ্বাস করতে পারছি না। বনির ক্ষেত্রে সবই সম্ভব। আমি তোমাদের আবার বলছি, বনিকে আমেরিকায় রাখাটা ঠিক হবে না। তোমরা যদি পারো ওকে নিয়ে কোনও দূর দেশে চলে যাও।”

প্রতিভা করুণ মুখ করে বললেন, “আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এত উন্নত ধরনের চিকিৎসা নেই। জল-হাওয়াও ভাল নয়। তা ছাড়া আমরা আমেরিকাকেই আমাদের দেশ করে নিয়েছি।”

ক্রিল মাথা নেড়ে বললেন, “বনির চিকিৎসা পৃথিবীর কোথাও হবে। আমার মনে হয় আমেরিকায় ও নিরাপদ নয়। এখন তোমরা যা ভাল বোঝো করবে।“

তিন-চারদিন পর একদিন সকালবেলায় বাবুরাম অফিসে গেছেন। একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। ক’দিনের মধ্যেই কনকনে হাওয়া বইবে, তারপর শুরু হবে তুষারপাত। প্রতিভা কিছু কাঁচাকাচি করে কাপড়গুলো বাইরের রোদে মেলে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা পপলার গাছের তলায় জনাপাঁচেক ভবঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। কারও হাতে ব্যাঞ্জো, কারও বেহালা, কারও বগলে বাঁশি। তারা খুব কৌতূহল নিয়ে এবাড়ির দিকে চেয়ে আছে।

ভবঘুরে দেখে প্রতিভা খুব ভয় পেলেন। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর জানালার পর্দা সরিয়ে লক্ষ করতে লাগলেন, ওরা কী করে। দেখতে পেলেন, পাঁচ জনের মধ্যে দুজন। মেয়েও আছে। সকলেরই উলোঝুলো পোশাক এবং নোংরা।

প্রতিভা ভেবে দেখলেন, এরা যদি সবাই মিলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে তা হলে তিনি আটকাতে পারবেন না। সুতরাং তিনি পুলিশে ফোন করতে গেলেন। কিন্তু টেলিফোন ডেড। এরাই বোধ হয় তার কেটে দিয়েছে। প্রতিভা শোওয়ার ঘরে গিয়ে কম্পিতবক্ষে বাবুরামের ড্রয়ার খুলে ভারী রিভলভারটা তুলে নিলেন। কোনও বেয়াদবি দেখলে আজ

তিনি কিছুতেই ওদের ছাড়বেন না। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে ভীষণ অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

পাঁচ জন বাউন্ডুলে, উলোঝুলো পোশাক-পরা পুরুষ ও মেয়ে তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইছে একযোগে। গানের কথা বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হয় এরা কারও জয়ধ্বনি দিচ্ছে। প্রতিভাকে দেখে গান গাইতে গাইতেও তারা অভিবাদন জানাতে লাগল বার বার।

কিছুক্ষণ বাদে গান থামিয়ে একজন এগিয়ে এসে বলল, "সুপ্রভাত। আমরা শুনেছি, তোমার একটি শিশুপুত্র আছে এবং সে অলৌকিক ক্ষমতা ধরে। আমরা তাকে একবার দেখতে এসেছি। ভয় নেই, আমরা দূর থেকে তাকে একবার দেখব এবং কিছু উপহার দিয়ে চলে যাব।"

"তোমরা কার কাছে একথা শুনেছ?"

"সে আমাদের বন্ধু এক বাউন্ডুলে। তার নাম এডি। সে চুরি করতে তোমার বাড়িতে ঢুকেছিল। তোমার ছেলেকে দেখে সে ভয়ে পেয়ে পালিয়ে যায়। আজও তার ভয় কাটেনি। সে বলছে, স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র তাকে ভর্ৎসনা করেছেন।"

প্রতিভার মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। তিনি ওপরে গিয়ে বনিকে কোলে নিয়ে নেমে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাউন্ডুলেরা মুগ্ধ চোখে বনিকে দেখল, তারপর সকলেই সাষ্টাঙ্গে উপুড় হয়ে পড়ে ভূমি-চুম্বন করে উঠে কেউ সিকি ডলার, কেউ একটা ফল, কেউ তার বাঁশিটা উপহার হিসেবে দরজার সামনে রাখল। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

এরকম দৃশ্য প্রতিভা কখনও দেখেননি। যেমন অবাক হলেন, তেমনই খুশিও হলেন। ভবঘুরে বাউন্ডুলেরা সবাই তা হলে খারাপ নয়।

দুদিন পরেই হঠাৎ হইহই করে বাড়িতে এসে চড়াও হল টেলিভিশন টিম। তাদের সঙ্গে ক্যামেরা, রিফ্লেক্টর, যন্ত্রলাগানো গাড়ি। হাসপাতাল সূত্রে তারা শুনেছে বনি এক অদ্ভুত শিশু। তারা বনির খবর সারা দেশে প্রচার করতে চায়।

বাবুরাম আর প্রতিভার সাক্ষাৎকারও তারা নিল। পরদিন টেলিভিশনে বনির ছবি আর বাবুরাম এবং প্রতিভার সাক্ষাৎকার ফলাও করে প্রচার করা হল। ফলে পরদিন থেকেই কৌতূহলী লোকজন আসতে লাগল বনিকে দেখতে। তারা নানা রকম উপহারও দিয়ে যেতে লাগল। এল অজস্র টেলিফোন। আসতে লাগল চিঠি, টেলিগ্রাম, ডলার। বাবুরাম আর প্রতিভা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলেন।

বাবুরাম ডাক্তার ক্রিলকে টেলিফোন করে বললেন, "বনির কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এভাবে মিডিয়াকে জানিয়ে দিয়ে ঠিক কাজ করেনি ডাক্তার ক্রিল। আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

ডাক্তার ক্রিল খুব মোলায়েম গলায় বললেন, "আমি এরকমই চেয়েছিলাম। যাতে অতিষ্ঠ হয়ে তোমরা আমেরিকা ছেড়ে পালাও। তোমাদের কি যাওয়ার জায়গা নেই?"

বাবুরাম বিষঃ গলায় বললেন, "আছে। কিন্তু..."

"কোনও কিন্তু নেই। তোমাদের চলে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। আমি তোমাদের একটা কথা এতদিন বলিনি, আজ বলছি। বনির ওপর একটা দুষ্টচক্রেরও নজর আছে। তারা কী করতে চায় আমি জানি না। কিন্তু বনির ওপর অস্ত্রোপচার তারাই আমাকে করতে দেয়নি। সাবধান থেকো, আমার বিশ্বাস, তারা লোক ভাল নয়।"

বাবুরাম একথায় খুব ভয় পেলেন। কিন্তু প্রতিভাকে কিছুই বললেন না।

বাবুরাম ভেবে দেখলেন, বনিকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যেতে পারেন। সেখানে তাঁর বুড়ো বাবা আছেন, মা আছেন, ভাই-বোনেরাও আছেন। বনি সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন

না। বনি যে অস্বাভাবিক, বনি যে অসাড় এবং পঙ্গু এই সংবাদ তাঁদের জানাননি বাবুরাম। ভেবেছিলেন চিকিৎসা করে বনিকে সুস্থ করে দেশে গিয়ে মা বাবাকে দেখিয়ে আনবেন। বাবাও নাতিকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে বার বার চিঠি দিচ্ছেন। চিঠি দিচ্ছেন মাও। নাতির কী নাম রাখা হবে তাই নিয়ে দাদু আর ঠাকুমাতে নাকি রোজই। তকাতর্কি হচ্ছে।

বাবুরাম প্রতিভাকে বললেন, "এই টেনশন আর লোকজনের ভীড় আর ভাল লাগছে না। চলো, দেশ থেকেই ক'দিনের জন্য ঘুরে আসি।"

প্রতিভা রাজি হয়ে বললেন, "সেই ভাল।" বা

বুরাম বললেন, "কিন্তু বনির অসুস্থতা সম্পর্কে বাড়ির লোক কিছুই জানে না। বাবা-মা বনিকে দেখে খুবই মুষড়ে পড়বেন। আমার মনে হয় এঁদের এ ব্যাপারটা চিঠি লিখে আগেভাগেই একটু জানিয়ে দেওয়া ভাল।"

বাবুরাম বাড়িতে চিঠি লিখলেন এবং অফিসে ছুটির দরখাস্ত করে যাওয়ার জন্য অগ্রিম তোড়জোড় শুরু করলেন। বাবুরাম খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার কারণ বললেই ছুটি পাওয়া শক্ত। অনেক আঁটঘাট বেঁধে তবে ছুটি নিতে হয়।

দেশে যাওয়ার কথায় প্রতিভা খুব খুশি। আমেরিকায় তাঁরা খুবই সুখে আছেন বটে কিন্তু দেশ হল অন্য জিনিস। দরিদ্র হোক, শত অসুবিধে থাকুক তবু ওই মাটির টান কখনও কমে না।

প্রতিভা এক দুপুরবেলা বনিকে আদর করতে করতে বললেন, "জানিস বনি, আমরা তোকে নিয়ে দেশে যাব। তুই দাদু-ঠাম্মাকে দেখবি, দাদামশাই-দিদাকে দেখতে পাবি। কাকা পিসি মাসি মামারা কত আদর করবে তোকে..."

বনির কালো চোখ হঠাৎ নীলকান্তমণির দ্যুতিতে ভরে উঠল। এমন আশ্চর্য নীল প্রতিভা কখনও দেখেননি। তিনি বনিকে বুকে চেপে ধরে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "বনি! বনি! তোর কী হল হঠাৎ?"

এই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল। প্রতিভা গিয়ে টেলিফোন ধরতেই একটা গম্ভীর গলা মার্কিন ইংরেজিতে বলে উঠল, "সুপ্রভাত। আমি কি বনির মা'র সঙ্গে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ। আমিই বনির মা। কী চাই?"

"আমরা শুনেছি আপনারা বনিকে নিয়ে ভারতবর্ষে চলে যেতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?"

"আমি যে-ই হই, যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। বনিকে এ-দেশ থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আপনারা ঘোর বিপদে পড়বেন।"

"তার মানে?"

"বনি এ-দেশেই থাকবে। যদি ওকে নিয়ে পালাতে চান তা হলে আপনাদের বাধা দেওয়া হবে এবং বনিকে আপনাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।"

ফোন কেটে গেল। প্রতিভা স্তম্ভিত হয়ে ফোনটার দিকে চেয়ে। রইলেন।

বাবুরাম বিকেলবেলায় এসে স্ত্রীর কাছ থেকে সব শুনে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। বললেন, "পুলিশের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর তো পথ দেখছি না।"

প্রতিভা মাথা নেড়ে বললেন, "কক্ষনো নয়। পুলিশ এ ব্যাপারে নাক গলালে আমার বনির যদি বিপদ হয়?"

"তা হলে কী করব? ডাক্তার ক্রিল আমাকে সেদিন গোপনে বলেছেন একটা দুষ্টচক্র বনির সম্পর্কে তাঁকেও হুমকি দিয়েছে। এরা নাকি বিপজ্জনক লোক।"

প্রতিভা বললেন, "বনির ভালর জন্য আমাদের সবকিছুই মেনে নিতে হবে।"

বাবুরাম অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, "দ্যাখো, আমার মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, বনির জন্মের পিছনে একটা রহস্যময় কারণ আছে। আমি নিজে সায়েন্টিস্ট বলেই বলছি, কারণটা হয়তো বৈজ্ঞানিক। সেই ডেলাওয়্যার ওয়াটার গ্যাপে বেড়াতে যাওয়ার পথে আমাদের যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল তার কথা মনে আছে?"

"বাবাঃ, মনে থাকবে না! খুব আছে।"

"আমার মনে হয় ওই অ্যাকসিডেন্টটাও স্বাভাবিক ছিল না। অ্যাকসিডেন্ট স্পট থেকে কে বা কারা আমাদের দুজনকে অনেক দূরে একটা পোড়ো বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন বনি সদ্য মাতৃগর্ভে এসেছে। সেই সময়ে কিছু উন্নত মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক এমন কিছু ওষুধ তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল বা কোনও সূক্ষ্ম উপায়ে গর্ভস্থ ভ্রূণের এমন কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল যার ফলে বনির আজ এই অবস্থা।"

"তা হলে আমরা কী করব এখন?"

"আমার সন্দেহ হচ্ছে, বনিকে কোনও একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

"সে কী!" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন প্রতিভা।

"ঘাবড়ে যেও না। আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না। শুধু সন্দেহই হচ্ছে। তবু আমার ইচ্ছে এব্যাপারটা নিয়ে একটু অনুসন্ধান করি। সামনের উইক এন্ডে চলো আমরা আবার সেই জায়গাটায় যাই।"

“আবার যদি বিপদ হয়?”

“ভয় পেও না। আমাদের এখন যে বিপদ চলছে তার চেয়ে বেশি বিপদ আর কী হতে পারে? বনি সম্পর্কে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না। না জানলে ওর সমস্যার সমাধান করব কীভাবে?”

“বনিকে নিয়েই তো যাব?”

“হ্যাঁ। অবশ্যই।”

প্রতিভা চেয়ে দেখলেন, বনির চোখ থেকে এক আশ্চর্য গোলাপি আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

“বনি!” বলে ফের চেঁচালেন প্রতিভা।

বাবুরাম গিয়ে ছেলের অসাড় দেহটি কোলে তুলে নিয়ে তার কানেকানে বললেন, “বনি, আমি জানি তোমার শরীর অসাড় হলেও তোমার মগজ নয়। তুমি সবই বুঝতে পারছ। হয়তো আমাদের চেয়েও তোমার মগজের শক্তি বেশি। তুমি কী বলল বাবা, আমরা কি ওই জায়গাটায় যাব? যাওয়া কি উচিত?”

চোখের ভুলও হতে পারে, তবু বাবুরামের মনে হল, বনির ঠোঁটে যেন একটা খুব হালকা হাসির ছোঁয়া চকিতে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

বনির বয়স মাত্র এক বছর। এই ছোট বাচ্চার বোধ শক্তি প্রবল নয়। বনির ক্ষেত্রে তো আরও নয়। তবু কি বনি বাবুরামের কথা বুঝতে পারল এবং সায় দিল?

বাবুরাম নিশ্চিন্ত হয়ে প্রতিভাকে বললেন, “আমরা যাব।”

প্রতিভা মাথা নেড়ে বললেন, “ঠিক আছে।”

২. গদাইবাবুর একদিন হঠাৎ মনে হল

গদাইবাবুর একদিন হঠাৎ মনে হল, চারদিকে বিজ্ঞানের এমন বাড়বাড়ন্ত হয়েছে যে, এ-যুগে বিজ্ঞান না-জানাটা খুবই খারাপ। অফিস থেকে ফিরে তিনি ছেলে টমটমকে ডেকে বললেন, "ওরে টমটম, এই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান না জানলে তো কিছুই হবে না।"

টমটম মাথা চুলকে মিনমিন করে বলল, "কিন্তু বিজ্ঞান যে আমার মাথায় সেঁধোয় না।"

গদাইবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, ওটা কাজের কথা নয়। বিজ্ঞানে তোমার আগ্রহ বাড়াতে হবে, বিজ্ঞানকে ভালবাসতে হবে। হাতে কলমে বিজ্ঞানচর্চা করলে আগ্রহ বাড়বে। দাঁড়াও। কালই বিজ্ঞানচর্চার জন্য জিনিসপত্র কিনে আনতে হবে।"

দুঃখের বিষয় গদাইবাবুও বিজ্ঞানের কিছুই জানেন না। বাড়িতে বিজ্ঞানচর্চা করতে হলে কী কী জিনিস লাগে এবং সেগুলো কোথা

থেকে পাওয়া যাবে তাও তিনি জানেন না। তবে সহজে দমবার পাত্র তিনি নন। ক্রমশ খোঁজ নিয়ে নিয়ে নানা দোকান ঘুরে তিনি জিনিসপত্র কিনতে লাগলেন।

মুর্গিহাটার একটা দোকানে দেখলেন সায়েন্স কিট বলে পলিথিনের সিল করা প্যাকেট রয়েছে।

"ওগুলো কী?"

দোকানদার মাথা নেড়ে বলে, "জানি না মশাই, এসব মাল হংকং থেকে আসে। কখনও খুলেও দেখি না। তবে শুনতে পাই ওর মধ্যে নানারকম পার্টস আছে। হাড় জুড়ে নানারকম জিনিস হয়। ব্যবহারবিধি ভিতরেই দেওয়া আছে।"

এক-একটা প্যাকেটের গায়ে এক-একটা নাম লেখা। জাম্পিং জো, ডুমস ডে, অটোমেটিক কার এইসব। একটা প্যাকেটের গায়ে লেখা মিস্টিরিয়াস মিস্টার পানচো।

দরদাম করে তিনি ‘পানচো’ লেখা প্যাকেটটা কিনে ফেললেন।

বাড়িতে এসে বাপ ব্যাটায় মিলে চিলেকোঠার ঘরটা সাফ করে ল্যাবরেটরি সাজিয়ে ফেললেন। বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই হরবাবুকে ডেকে আনা হল। তিনি সব দেখেশুনে বললেন, “ভালই হয়েছে। আমিও মাঝে-মাঝেই এসে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারব।”

ল্যাবরেটরি তৈরি হওয়ার পর সত্যিই টমটম আর গদাইবাবুর বিজ্ঞানে খুব মন হল। হরবাবু এসে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়ে দিয়ে যান, বাপ ব্যাটায় মিলে সেগুলো করে ফেলতে লাগলেন।

এইভাবে ক’দিনের মধ্যেই দু’জনে বিজ্ঞানের অনেককিছুই জেনে ফেললেন।

একদিন টমটম বলল, “বাবা, ওই প্যাকেটটা কিন্তু খোলাই হয়নি। টেবিলের তলায় পড়ে আছে।”

গদাইবাবু বললেন, “তাই তো। তা হলে আয় খুলে দেখা যাক।”

প্যাকেটটা বেশ বড়। ওজনও কম নয়। একটা স্ট্রিপ দিয়ে প্যাকেটের মুখ আটকানো।

প্যাকেট খুলে দেখা গেল, তাতে ছোট বড় নানারকম যন্ত্রাংশ রয়েছে। নির্দেশাবলীর একখানা ছাপা কাগজও রয়েছে সঙ্গে। তাতে লেখা, মিস্টিরিয়াস মিস্টার পানচো সম্পর্কে আমরা আগেভাগে কিছুই বলতে পারব না। সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মিস্টার পানচোকে দিয়ে কী কাজ হবে সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত নই। এটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক একটি যন্ত্র। এ দিয়ে ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।

কীভাবে মিস্টার পানচোকে তৈরি করা যাবে তার একটা ক্রম দেওয়া আছে।

যন্ত্রটি রহস্যময় বলেই গদাইবাবু এবং টমটম আরও উৎসাহ পেয়ে গেলেন।

সন্ধেবেলা যন্ত্রটা বানাতে বসবার কিছুক্ষণ পরই বোঝা গেল, যন্ত্রাংশগুলি খুবই জটিল। লাগানো বড় সোজা কথা নয়। সবচেয়ে বড় অংশটা একটা ব্যারেল বা পিপের মতো জিনিস। সেটা সিল করা। তার গায়ে নানারকম সকেট আর পয়েন্ট রয়েছে, যাতে

অন্যান্য জিনিস জোড়া হবে।

দুজনে মিলে ঘণ্টা-দুয়েকের চেষ্টায় মোটে তিন-চারটে জিনিস ঠিকমতো জুড়তে পারলেন। রাতের খাওয়ার ডাক আসায় কাজটা আর শেষ হল না।

পরদিন সকালে আবার বাপ-ব্যাটায় গিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকলেন বাকি অংশগুলো জুড়তে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁদের চক্ষুস্থির। যন্ত্রাংশগুলো কে যেন ইতিমধ্যেই জুড়ে দিয়েছে।

এটা কার কাজ তা বুঝতে না পেরে গদাইবাবু খুব রেগে গেলেন এবং বাড়ির অন্যান্য লোকদের বকাবকি করলেন। কিন্তু কে লাগিয়েছে তা ধরা গেল না।

টমটম অবশ্য নির্দেশ মিলিয়ে দেখে বলল, "বাবা, পার্টসগুলো কিন্তু ঠিক-ঠিকই লাগানো হয়েছে। যে-ই লাগাক সে আনাড়ির মতো কাজ করেনি।"

একথা শুনে গদাইবাবু একটু ঠাণ্ডা হলেন। তারপর জিনিসটা দেখতে লাগলেন।

মিস্টিরিয়াস মিস্টার পানচো এককথায় একটি বিতিকিচ্ছিরি চেহারার জিনিস। ব্যারেল বা ঢোলটাই হল তার ধড়। দু'খানা হাতের মতো জিনিস আছে, দু'খানা পায়ের মতোও জিনিস আছে, চাকাও আছে, একটি লেজ আছে। তবে মাথা নেই, তার বদলে একটা ডিসক অ্যান্টেনার মতো জিনিস লাগানো। সব মিলিয়ে বিদঘুঁটে।

গদাইবাবু যন্ত্রটার নানা অংশ নেড়েচেড়ে দেখলেন। কোনও ঘটনা ঘটল না। যন্ত্রটা নড়াচড়া করে উঠল না, কোনও শব্দটব্দও কিছু হল না।

টমটম বলল, "এটা দিয়ে কী হবে বাবা?"

গদাইবাবু ঠোঁট উলটে বললেন, "কী জানি বাবা। কিছুই বোধ হয় হবে না। মিস্টিরিয়াস মিস্টার পানচো মিস্টিরিয়াসই থেকে যাবে মনে হচ্ছে। টাকাগুলোই গচ্চা গেল।"

টমটমও হতাশ হয়ে বলল, "খানিকটা মানুষ-মানুষ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এটা দিয়ে পুতুল-খেলাও যায় না।"

সুতরাং মিস্টার পানচোকে চিলেকোঠার একটি কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা হল। তার কথা আর কারও তেমন মনে রইল না।

পরদিন সকালে বাড়ির গিন্নি বললেন, "রাতে আমাদের বাড়িতে কিন্তু চোর এসেছিল।"

গদাইবাবু বললেন, "চোর এসেছিল! কীরকম?"

"তা কি আমি দেখেছি? মনে হচ্ছে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে ছাদের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। ছাদে হাঁটাহাঁটির শব্দ পেয়েছি।"

"তা হলে ডাকোনি কেন?"

"আজকাল চোরদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকে। তোমাকে ডাকলে তুমি তো ঘুমের চোখে চোর ধরতে ছুটতে, ছোরা বসিয়ে দিলে বা গুলি করলে কী হত? তাই ডাকিনি। তবে চোর বেশিক্ষণ ছিল না। দু-তিন মিনিট বাদেই হাঁটাহাঁটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

গদাইবাবু মিস্তিরি ডাকিয়ে ছাদের দরজাটা আরও মজবুত করলেন তো বটেই, একটা কোলাপসিবল গেটও বসিয়ে দিলেন। আরও সতর্কতার জন্য একটা কুকুরও নিয়ে এলেন কিনে। বাচ্চা অ্যালসেশিয়ান, তবে বেশ চালাক-চতুর।

সেই রাতেই ফের চোর এল এবং বিশেষ গভীর রাতেও নয়। রাত বারোটা নাগাদ প্রথম কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে ছাদের দিকে। তারপর ছাদে শব্দও পাওয়া গেল। ঠিক পায়ের শব্দ নয়। অনেকটা যেন কিছু গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ।

গদাইবাবু সাহসী লোক। তিনি কারও বারণ না শুনে টর্চ আর পিস্তল নিয়ে ছাদে উঠলেন। কোথাও কিছু দেখা গেল না। চিলেকোঠার তালা খুলে দেখলেন, সবই ঠিক আছে। এমনকী, কুলুঙ্গিতে পানচো অবধি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ফিরে এসে গদাইবাবু বললেন, "ও আমাদের শোনার ভুল।" গিন্নি বললেন, "আমাদের ভুল হতে পারে, কিন্তু কুকুরের ভুল হয়

গদাইবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কুকুর যতই চালাক হোক, সে মানুষের চেয়ে ইতর প্রাণী। মানুষের যদি ভুল হতে পারে কুকুরের হতে বাধা কোথায়?"

এই নিয়ে একটা তকাতর্কি হল বটে, কিন্তু রহস্যটার সমাধান হল না।

গদাইবাবুর টমটম ছাড়াও আরও তিন ছেলেমেয়ে। সবচেয়ে ছোটটি মেয়ে, বয়স মাত্র সাত মাস। সেদিন গদাইবাবু অফিসে আর ছেলেমেয়েরা যে যার স্কুলে গেছে। ঘোট মেয়েকে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে গদাই-গিন্নি রান্নাঘরে ব্যস্ত রয়েছেন। বাচ্চা কাজের মেয়ে বকুল গিন্নিমার সঙ্গে টুকটাক কাজ করছে। এমন সময়ে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল।

মেয়েটা পাছে গড়িয়ে খাট থেকে পড়ে যায় সেজন্য মোটা পাশবালিশ দেওয়া আছে দু দিকে। তা ছাড়া মশারিও আছে। মেয়ে কাঁদছে শুনে গদাই-গিন্নি তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারছিলেন। সারতে সারতেই শুনতে পেলেন কান্না থামিয়ে মেয়ে যেন কার সঙ্গে 'অ অ করে খুব কথা বলছে। হাসছেও।

ঘরে এসে যা দেখেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। মেঝের ওপর মাদুর পাতা, তার ওপর মেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। চারদিকে পুতুল বল খেলনাগাড়ি সাজানো। মেয়েকে বিছানা থেকে

কে নামাল, কে মাদুর পাতল, কে খেলনা নামিয়ে দিল তা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে তিনি হাঁ হয়ে রইলেন।

বাড়িতে কোনও লোক নেই, তিনি আর বকুল ছাড়া। তবু তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলেন।

গদাইবাবু বাড়ি ফিরলে গিন্নি হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, "বাড়িতে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

গদাইবাবু সব শুনে বললেন, "চোরের পর তোমার মাথায় আবার ভূতের বায়ু চাপল? আরে, এ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। ভূত-টুত এ-যুগে অচল। ওসব নয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের কেউ চুপি-চুপি এসে একাণ্ড করে গেছে, তোমাকে একটু বোকা বানানোর জন্য।"

"অসম্ভব। সদর-দরজা আমি নিজে হাতে ডবল ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করেছিলাম। খিড়কির দোরেও হুড়কো দেওয়া ছিল।"

গাইবাবু আর বিজ্ঞান কপচানোর সাহস পেলেন না। তবে ঘটনাটা নিয়ে মাথা ঘামালেন না তেমন।

সন্ধেবেলা রোজকার মতো ছেলেকে নিয়ে তিনি ল্যাবরেটরিতে এলেন এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। আজ তিনি ভ্যানিশিং ক্রিম, শ্যাম্পু আর কলিং বেল তৈরি করে সবাইকে অবাক করে দেবেন বলে জিনিসপত্র সব সাজিয়েই রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে ঢুকে খুব তাজ্জব হয়ে দেখলেন, কে বা কারা ইতিমধ্যেই এসে ভ্যানিশিং ক্রিম, শ্যাম্পু এবং কলিং বেল তৈরি করে রেখে গেছে। আর জিনিসগুলো হয়েছেও বেশ উঁচু মানের।

"এ কী রে টমটম, এসব করল কে! তুই নাকি?"

টমটমও ভীষণ অবাক। মাথা নেড়ে বলল, "না তো বাবা। স্কুল থেকে এসে আমি ত ক্রিকেট খেলছিলাম। একটু আগে ফিরেছি।"

“তা হলে ল্যাবরেটরিতে কে ঢুকেছিল তালা খুলে?”

বেশ চিন্তিতভাবে গদাইবাবু আর টমটম বসে ছিল, এমন সময় বকুল এসে খবর দিল, পাড়ার দু’জন তোক দেখা করতে এসেছে।

গদাইবাবু নীচে নেমে এসে দেখেন পাশের বাড়ির গগন রায় আর আর-একজন প্রতিবেশী কানু বোস।

গগনবাবু বললেন, “তা ভায়া, তুমি তো বেশ দিব্যি একটা জেনারেটর কিনেছ। পাড়ায় লোডশেডিং আর তোমার বাড়িতে সব ঘরে আলো ঝলমল করছে।”

গদাইবাবু হাঁ হয়ে বললেন, “লোডশেডিং! জেনারেটর! না তো, আমি তো জেনারেটর কিনিনি। একটা ইনভাটার ছিল, তা তারও ব্যাটারিটা কদিন আগে ডাউন হয়ে গেছে।”

গগনবাবু অবাক হয়ে বললেন, “তা হলে আলো-টালো জ্বলছে। কিসে?”

গদাইবাবু বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন, বাস্তবিকই পাড়ায় লোড়শেডিং চলছে। কিন্তু তাঁর বাড়িতে ঝলমল করছে আলো। তিনি মাথা চলকে বললেন, “মনে হচ্ছে কোনও হট লাইনের সঙ্গে আমার বাড়ির একটা অ্যাকসিডেন্টাল কানেকশন হয়ে গেছে।”

মুখে গদাইবাবু যা-ই বলুন তাঁর মন সে কথা বলছে না।

প্রতিবেশীরা চলে যাওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন।

বায়ু বেশ চড়ে যাওয়ায় রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না গদাইবাবুর। বারবার এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। রাত তিনটের সময় হঠাৎ রান্নাঘরে একটা খুটখাট শব্দ পেয়ে তিনি ঝপ করে উঠে পড়লেন। হাতে টর্চ আর পিস্তল। পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে তিনি দেখলেন, আলো জ্বলছে। ভিতরে কেউ নেই। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এক কাপ গরম চা সাজানো রয়েছে।

গদাইবাবুর চোখের পলক পড়ছিল না। রাত জাগার ফলে তাঁর ভিতরে একটা চা খাওয়ার ইচ্ছে যে চাগাড় দিয়েছে তা এতক্ষণ তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি। চা দেখে বুঝলেন, এখন তাঁর এই জিনিসটিই সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল।

চা তিনি নিলেন এবং চুমুকও দিলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "ভূতের চা বাবা, খেয়ে না আবার কোনও গণ্ডগোলে পড়ি। তবে উপকারী ভূত, এইটেই যা সান্ত্বনা।"

কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে ভূতকেই বা মানেন কী করে গদাইবাবু? যতই ভূতুড়ে কাণ্ড হোক তার পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারণ থাকবেই থাকবে। বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই ঘটছে না।

চা খুবই ভাল হয়েছে। চা খেয়েই তাঁর বেশ ফুরফুরে লাগল এবং ঘুমও পেল। তিনি বিছানায় শুয়ে অঘোর ঘুমে ঢলে পড়লেন।

পরদিন বিকেলে যে কাণ্ড ঘটল তার জন্য অবশ্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। পরদিনও সন্ধেবেলায় চারদিকে লোডশেডিং এবং যথারীতি গদাইবাবুর বাড়িতে আলো জ্বলছে। পাড়ার দু-চারজন ব্যাপারটা দেখতে এসেছেন।

পটলবাবু বললেন, "নাঃ গদাইবাবু, আপনার কপালটা বড্ডই ভাল। ইলেকট্রিক কোম্পানির ভুলে আপনি দিব্যি লোডশেডিং-এর হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।"

গদাইবাবু খুব ম্লান একটু হাসলেন।

বাইরের ঘরে টিভি চলছে, তাতে বাচ্চাদের কীসব প্রোগ্রাম দেখানো হচ্ছে।

হঠাৎ শান্তিবাবু বললেন, "আরে! দেখুন তো, এটা টিভিতে কী দেখাচ্ছে! এ তো আমাদের দেশের প্রোগ্রাম নয়।"

সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, গদাইবাবুর সাদা কালো টিভির পরদায় রঙিন ছবি আসছে। আমেরিকার এন বি সি'র নিউজ চ্যানেলে একজন শ্বেতাঙ্গ খবর পড়ছেন।

গগনবাবু বলে উঠলেন, "গদাই, তোমার তো রঙিন টিভি ছিল! কবে কিনলে?"

গদাইবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "এই আর কি।"

শান্তিবাবু বলে উঠলেন, "কিন্তু এইমাত্র যে সাদা-কালো ছবিই দেখা যাচ্ছিল।"

গাইবাবু একথাটা না-শুনবার ভান করলেন। কারণ আসল কথাটা হল তাঁর রঙিন টিভি নেই। অথচ চোখের সামনে তাঁর সাদা-কালো টিভিতে দিব্যি বাহারি রঙের ছবি দেখা যাচ্ছে। আর প্রোগ্রামটা দেখার মতো। এন বি সি নিউজ। এন বি সি .যে আমেরিকার একটি সংস্থা তা তিনি ভালই জানেন।

শান্তিবাব বললেন, "হয়তো হতেও পারে যে, আমেরিকার প্রোগ্রাম এখান থেকে রিলে করে দেখানো হচ্ছে। পাড়ায় লোডশেডিং না হলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা যেত আশপাশের বাড়িতে।"

গদাইবাবু চুপ করে রইলেন, কারণ তিনি নিজেও বেশ ব্যোমকে গেছেন।

যাই হোক, সবাই মিলে টিভির এই নতুন ধরনের প্রোগ্রামটা মন দিয়েই দেখতে লাগলেন। হঠাৎ খবরে বলল, "এখন তোমাদের কাছে আমরা একটি অদ্ভুত শিশুকে হাজির করছি। ছেলেটির নাম বনি। এ হল বাবুরাম আর প্রতিভা নামক একটি ভারতীয় দম্পতির শিশুপুত্র। এ-ছেলেটির শরীর অসাড়, সে শব্দ করে না, কাঁদে না, হাসে না, কিন্তু ডাক্তার ক্রিল বলেছেন, ছেলেটির মস্তিষ্ক খুবই উন্নত মানের। এরকম শিশু পৃথিবীতে দুর্লভ।"

খবরের সঙ্গে-সঙ্গে একটি শিশুর ছবি টিভিতে দেখানো হল। ভারী সুন্দর চেহারা বাচ্চাটার। কিন্তু সে অসাড়।

গদাইবাবু এসব দেখছেন আর সকলের অলক্ষে চোখ কচলাচ্ছেন, নিজের গায়ে চিমটিও কাটছেন। স্বপ্ন দেখছেন কি না বুঝতে পারছেন না। নাকি পাগল হয়ে গেলেন?

লোডশেডিং-এর মধ্যে ঘরে আলো জ্বলছে, সাদাকালো টিভিতে রঙিন ছবি দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় বসে আমেরিকার এন বি সি'র খবর শুনছেন–এসবের মানে কী?

হঠাৎ টিভির ছবি পালটে গেল। দেখা গেল হংকং থেকে এক ভদ্রমহিলা খবর পড়ছেন। তিনি খবরের যে অংশটা পড়ছিলেন তাতে জানা গেল, সম্প্রতি চিন থেকে নাকি একজন বৈজ্ঞানিক অনেক কষ্টে তাইওয়ানে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম ডাক্তার ওয়াং। তিনি নাকি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁর দেশের বৈজ্ঞানিক অকাঁদেমি সেই আবিষ্কারটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। তিনি সেই দাবি মানেননি। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করার হুমকি দেওয়া হয়। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তাঁর আবিষ্কারটি নিয়ে পালিয়ে আসেন।

টিভির পরদায় ডাক্তার ওয়াংকে দেখা গেল। বেঁটে-খাটো মাঝবয়সী একজন লোক। চেহারাটা দেখে হাসিই পায়। যেন কুমড়োপটাশ। চোখমুখে আতঙ্ক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, "ডাক্তার ওয়াং, আপনি কোন কৌশলে পালালেন?"

ওয়াং রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে বললেন, "আমাদের দেশে একরকম ভেষজ আছে, তার নাম জিন সেং। সেটা খুব রফতানি হয় বড়বড় প্যাকিং বাক্সে। ওরকমই একটা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে আমি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ঢুকে পড়ি, আমার আবিষ্কারটি সঙ্গে ছিল। তাইওয়ানে এসে পৌঁছতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এ-দেশটা আরও বিচ্ছিরি।"

"কেন ডাক্তার ওয়াং? হংকং তো খুব উন্নত শহর?"

"শহর উন্নত হলে কী হবে? এদেশে আসবার সঙ্গেসঙ্গেই আমার আবিষ্কার চুরি হয়ে যায়। সেই থেকে আমার রাতে ঘুম নেই, ভাল করে খেতে পারি না..."

বলতে বলতে ওয়াং রুমালে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। চিনা বা জাপানিরা সহজে কাঁদে না। কান্না তাদের ধাতেই নেই। এমনকী ওসব দেশে বাচ্চাদেরও খুবই কম কাঁদতে দেখা যায়। সুতরাং, বোঝা গেল, ডাক্তার ওয়াং খুবই মনোকষ্টে আছেন।

"আপনার আবিষ্কারটি ঠিক কী ধরনের তা কি একটু দয়া করে বলবেন?"

ডাক্তার ওয়াং চোখ মুছে বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, "আবিষ্কারটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। হলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। তবে ও-বিষয়ে আমি খোলাখুলি কিছুই বলব না। তা হলে যারা জিনিসটা চুরি করেছে তারা জো পেয়ে যাবে।"

"আবিষ্কারটি কী এমন যা আনাড়ির হাতে পড়লে ক্ষতি হতে পারে?"

"খুবই পারে। অসাবধানে ওটি ঘাঁটাঘাঁটি করলে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। সেসব কাণ্ডের কথা আর না-ই বা বললাম।"

"কীভাবে ওটি চুরি গেল তা একটু বলুন।"

"তাইওয়ানে আসার পর আমি একটি হোটেলে ছিলাম। হংকং-এর একটি বড় হোটেল। ঘর থেকে আমি বড় একটা বেরোতুম না। নিজের পরিচয়ও কাউকে দিতাম না। সারাদিন হোটেলের ঘরে নিজের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতাম। তবে হোটলের কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। হোটেলের ঘরে বিজ্ঞানচর্চা তারা আমাকে করতে বারণ করে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ঘর ফাঁকা, সব যন্ত্রপাতি হাওয়া, সেইসঙ্গে আমার সব মালপত্রও। আমি চেঁচামেচি হইচই বাধিয়ে দিই। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, হোটেলওয়ালাই চুরিটা করিয়েছে আমাকে তাড়ানোর জন্য। পরে পুলিশ আসে এবং তারা নানারকম তদন্ত করে আমাকে জানায়, এটা বাইরের লোকের কাজ। এই হোটেলের খুবই সুনাম আছে, এখান থেকে কারও কিছু চুরি যায়নি কখনও।"

"আপনার কাকে সন্দেহ হয় ডাক্তার ওয়াং?"

"দেখুন, আমি পরিচয় না দিলেও বিশ্ব-দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক মহলে। সবাই আমায় চেনে। আমার ছবি পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞান জানালে বেরোয়। আমার সন্দেহ, হংকং-এ আমাকে কেউ চিনতে পেরেছে এবং সে আমার আবিষ্কারের কথাও জানে। সম্ভবত আমার রাতের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে চুরিটা করা হয়েছে।"

"আপনি এখন কী করবেন?"

ডাক্তার ওয়াং অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মষ্টিবদ্ধ হাত শন্যে ঘঁসি মারার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে বললেন, "চোরদের আমি ছেড়ে দেব না। আমি সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়ে আমার আবিষ্কারটি খুঁজব, চোরদের এমন শাস্তি দেব যে, তারা চিরদিন মনে রাখবে।"

এর পরই টিভিতে আবার কলকাতার প্রোগ্রাম চলে এল।

শান্তিবাবু বললেন, "গদাইবাবুর বাড়িতে এসে আজ অনেক লাভ হল। ফাঁকতালে আমেরিকা আর হংকং-এর খবর পেয়ে গেলুম।"

পাড়াপ্রতিবেশীরা বিদায় নেওয়ার পর গদাইবাবু খুব ভাল করে তার টিভি সেটটা লক্ষ করলেন। সেই পুরনো সেটটাই রয়েছে, কেউ বদলে দিয়ে যায়নি। টমটমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, এর মধ্যে কি কোনও মিস্ত্রি এসে আমাদের টিভি সেটটা মেরামত করেছে?

"না তো! আমার কি মনে হয় জানো বাবা? আমার মনে হয় আমাদের বাড়ির কোনও একটা ভালমানুষ ভূত এসে বাসা করেছে।"

গদাইবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূত বলে কিছু নেই। সবই বিজ্ঞান।"

তা হলে লোডশেডিং-এর মধ্যে আলো জ্বলছে কী করে? টিভিটা রঙিন হল কী করে?"

গদাইবাবু মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর মনেও নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে, সেদিন মাঝরাতে চা করে দিল কে? বাচ্চা মেয়েটাকে খাট থেকে নামিয়ে মাদুর পেতে বসাল কে? এই সব কী হচ্ছে? অ্যাঁ! ভূত তিনি মুখে না মানুন, কিন্তু মনের মধ্যে বেশ একটা ভূত-ভূত ভয় যে না হচ্ছে এমন নয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে। ভূতকে স্বীকারই বা তিনি করেন কী করে?

রাত্রিবেলা গদাইবাবুর ঘুম হচ্ছিল না। নানা কথা ভেবে মাথাটা গরম। হঠাৎ তাঁর মনে হল, নিশুত রাতে কে বা কারা যেন রেডিও বা বেতারযন্ত্র চালু করেছে। তিনি নানারকম ধাতব কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। গদাইবাবু টর্চ আর লাঠি নিয়ে উঠলেন এবং সব ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। রেডিওটার কাছে গিয়ে দেখলেন, সেটা থেকেই শব্দ আসছে। কোন কেন্দ্র থেকে কথা আসছে তা বুঝতে পারলেন না, তবে ভাষাটা চিনা বা জাপানি হতে পারে। কিছুক্ষণ শুনে বুঝলেন এটা কোনও বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান নয়। একজন যেন আর-একজনের সঙ্গে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে কথা বলছে। আরও কিছুক্ষণ শুনবার পর তাঁর মনে হল, এটা একটা লং ডিসট্যান্স টেলিফোন কল। তাঁর রেডিও ওই কলটাকে মনিটর করছে। গদাইবাবুর ছোট্ট ট্রানজিস্টর রেডিও খুবই কমজোরি যন্ত্র। দামেও শস্তা। সাধারণত কলকাতা কেন্দ্রেরই অনুষ্ঠান স্পষ্ট শোনা যায়। ব্যাটারিটাও পুরনো হয়েছে। এই রেডিওতে এসব ব্যাপার হওয়ার কথাই নয়।

হঠাৎ গদাইবাবুর মাথায় চিড়িক করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর টেপরেকর্ডারটা এনে রেডিওর কথাগুলো রেকর্ড করতে লাগলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল এই দুটি লোকের কথার মধ্যে কোনও একটা রহস্য থাকলেও থাকতে পারে। রেকর্ড করার আরও একটা কারণ ছিল। কথাবাতার মধ্যে তিনি বারবার ডাক্তার ওয়াং-এর নাম উচ্চারিত হতে শুনতে পেয়েছিলেন।

বেন্টিং স্ট্রিটের একটা চিনে দোকান থেকে বহুঁকাল ধরে জুতো কেনেন গদাইবাবু। চেনা দোকান। লোকটা তাঁকে খাতিরও করে। পরদিন অফিসের পর তিনি সোজা গিয়ে সেই

দোকানের চিনা মালিককে ধরলেন, এই ক্যাসেটের কথাবাতাগুলোর অর্থ বলে দিতে হবে। মনে হচ্ছে ভাষাটা চিনা।

লোকটা খুব খাতির করে দোকানের পিছন দিকে একটা ছোট্ট ঘরে। নিয়ে গদাইবাবুকে বসাল তারপর তার ছেলেকে ডেকে বলল, "তোমার ওয়াকম্যানটা নিয়ে এসো।"

ওয়াকম্যান এলে লোকটা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে মন দিয়ে কথাবাতাগুলো শুনে বলল, "গদাইবাবু, ভাষাটা ক্যান্টোনিজ চিনা। মনে হচ্ছে দুটো পাজি লোক কোনও শলাপরামর্শ করছে। ডাক্তার ওয়াং কাল লন্ডন রওনা হচ্ছেন, সেখানে যেন তাঁকে রিসিভ করা হয়। সেকথাই বলছে। আর একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথাও আছে। আর আছে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দামের কথাও। কিসের দাম তা অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না।"

"লোক দুটোকে তোমার পাজি বলে মনে হচ্ছে কেন?"

"ওদের কথাবার্তায় একটা লোককে খতম করে দেওয়ার প্রসঙ্গও আছে। তবে খুব স্পষ্ট করে নয়। যাই হোক, এরা যে ভাল লোক নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। লোক চরিয়েই আমি বুড়ো হলুম।"

ক্যাসেটটা নিয়ে গদাইবাবু বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, পাড়ায় লোডশেডিং চলছে এবং তাঁর বাড়িতে যথারীতি ঝলমল করছে আলো। বাইরের ঘরে আজও গগনবাবু আর শান্তিবাবু এসে বসেছেন। টিভি চলছে। দেখানো হচ্ছে বি বি সি'র খবর। গদাইবাবু খুবই চিন্তিতভাবে বসে খবর শুনতে লাগলেন। খবরটা তাঁর কাছে বেশ গুরুতরই মনে হল। বি বি সি'র সংবাদপাঠক বললেন, "বিশ্ববিখ্যাত চিনা বৈজ্ঞানিক ডক্টর ওয়াং হংকং-এ মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। শীঘ্রই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হবেন। যে আবিষ্কারকে নিয়ে তাঁর অনেক আশা- আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা হংকং থেকে চুরি হওয়ায় সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই আবিষ্কার খুঁজে বের করতে আন্তজাতিক গোয়েন্দাবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তবে এই আবিষ্কারটি

ঠিক কী বস্তু তা ডক্টর ওয়াং স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। ওদিকে চিনের তরফ থেকে ডক্টর ওয়াং-এর এই আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।”

৩. প্যান অ্যাম-এর একটি বোয়িং ৭৪৭

প্যান অ্যাম-এর একটি বোয়িং ৭৪৭ জাম্বো জেট বিমানের প্রথম শ্রেণীতে আজ একজন ভি আই পি হংকং থেকে লন্ডন যাচ্ছেন। বিমানসেবক ও সেবিকারা তটস্থ। বিমানটি কিছুক্ষণ পরেই লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে নামবে। ভি আই পি যাত্রীটি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে মাঝে-মাঝে তাঁর দামি হাতঘড়িটির দিকে চেয়ে দেখছেন। ভ্রূ কোঁচকানো, চ্যাপটা মুখে রাজ্যের বিরক্তি এবং উৎকণ্ঠা। তাঁর সামনে ও পিছনের দুটি-দুটি চারটি সারিতে সাদা পোশাকের দেহরক্ষীরা বসে আছে। তাদের সকলেরই চেহারা কুস্তিগির বা মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো। প্রত্যেকের কাছেই শক্তিশালী ওয়াকিটকি, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে।

ভি আই পি যাত্রীটির জন্য খাদ্য পানীয়ের কোনও অভাব নেই। কিন্তু তিনি কোনও খাদ্যই গ্রহণ করেননি। শুধু একবার খানিকটা জল খেয়েছেন, তাও সন্দিহান মুখে। এমনকী বিমানসেবিকাকে তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিজ্ঞেসও করেছেন, জলের মধ্যে বিষ বা ঘুমের ওষুধ নেই তো!

ভি আই পি যাত্রীটি হচ্ছেন চিনের দেশত্যাগী বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ ডক্টর ওয়াং। তাঁর বেঁটেখাটো, পেটমোটা চেহারাটা দেখলে কিছুতেই তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না। বরং কমিক চরিত্রের অভিনেতা বলেই বেশি মনে হয়। ডক্টর ওয়াং খুবই অস্থিরচিত্ত মানুষ। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। অন্তত দশবার টয়লেটে গিয়ে মুখে-চোখে জলের ঝাঁপটা দিয়েছেন। বারবার রুমালে মুখ মুছছেন। বিড়বিড় করে কথা বলছেন। আপনমনে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। অন্তত বিশবার বিমানসেবিকাকে প্রশ্ন করেছেন, লন্ডন পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে।

তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলে হাসাহাসি করছে।

আজ প্রথম শ্রেণীতে যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। ডক্টর ওয়াং বসেছেন সামনের দিকে। পিছনের দিকে মাত্র কয়েকজন যাত্রী আছেন। তাঁরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। কোনও এশিয়াবাসীকে আজ প্রথম শ্রেণীতে উঠতে দেওয়া হয়নি।

হঠাৎ বিমানে ঘোষণা হল, বিমান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হিথরো বিমানবন্দরে নামবে।

ওয়াং খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়লেন। ফের বসলেন। জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখলেন।

একটু বাদেই লন্ডন শহরের বিপুল বিস্তার দেখা গেল। লন্ডন ওয়াং-এর কাছে অচেনা জায়গা নয়। তিনি বহুবার বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগ দিতে লন্ডনে এসেছেন। তবু যেন প্রথম দেখছেন এমন কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইলেন নীচের দিকে।

বিমান ধীরে-ধীরে নামল এবং একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভূমিস্পর্শ করল।

ওয়াং তাড়াতাড়ি তাঁর অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, একজন সিকিউরিটি গার্ড তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকে বলল, "ডক্টর, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার নিরাপত্তার জন্য আপনাকে আমরা অন্য দরজা দিয়ে নামাব।"

ডাক্তার ওয়াং রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "মূর্খ। আমাকে বেশি গুরুত্ব দিলে শত্রুপক্ষের নজর আমার ওপরেই বেশি পড়বে-এটাও জানো না? আমাকে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে মিলেমিশে নামতে দাও।"

নিরাপত্তারক্ষী মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের ওপর হুকুম আছে, পাইলটের পাশের দরজা দিয়ে আপনাকে নামাতে হবে।"

ডক্টর ওয়াং হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

প্লেনের সামনের ডান দিকে যে-দরজা দিয়ে খাবারদাবার ইত্যাদি বিমানে তোলা হয় ওয়াংকে নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। নীচে একখানা গাড়ি টারম্যাকে অপেক্ষা করছিল। বুলেট প্রুফ গাড়ি। সামনে ও পিছনে দুটি পুলিশের গাড়ি।

ডাক্তার ওয়াং খুব বিরক্তির সঙ্গে এসব লক্ষ করলেন। প্রতিবাদ করে লাভ নেই বলে প্রতিবাদ করলেন না। সোজা গিয়ে গাড়িটায় উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটে চলল। তাঁকে পাশপোর্ট দেখিয়ে ইমিগ্রেশনের বাধা টপকাতে হল না। গাড়ি বিমানবন্দর পেরিয়ে ছুটে চলল হ্যাঁরোর দিকে।

ডক্টর ওয়াং বিড়বিড় করে বললেন, "সব নষ্ট হয়ে গেল! সব নষ্ট হয়ে গেল!"

পাশের সিকিউরিটি গার্ড বলল, "কী নষ্ট হয়ে গেল ডক্টর ওয়াং?"

ওয়াং জবাব দিলেন না। ভ্রূকুটি করে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন।

লন্ডনে উঁচু বাড়িঘর বিশেষ দেখা যায় না। বেশির ভাগ বাড়িই দোতলা বা তিন তলা। পুরনো বাড়ির সংখ্যা খুব বেশি। কারণ ইংরেজরা প্রাণে ধরে পুরনো কিছুই ভাঙতে বা বদলাতে চায় না। এ ব্যাপারটা ওয়াং-এর বেশ ভালই লাগে। তিনি লন্ডন শহরের দৃশ্য দেখে বেশি খুশি।

একটা মস্ত ফটকওলা বাড়ির ভিতরে গাড়িটা এসে ঢুকল। চারদিকে কড়া পাহারা। বাড়িটা লন্ডনের অন্যতম সেফ-হাউস। কাকপক্ষীও সহজে গলতে পারে না। ভিক্টোরিয় ধাঁচে তৈরি প্রকাণ্ড বাড়িটায় আরাম-বিলাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। আছে সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট, ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা, জিমন্যাশিয়াম ইত্যাদি। ওয়াং অবশ্য আরাম-বিলাসের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সোজা নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে টেলিফোন নিয়ে বসলেন। চটপট বোতাম টিপে নম্বর ধরলেন।

ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল, "ইয়েস।"

ওয়াং বললেন, "শোনো। আমি লন্ডনে পৌঁছেছি। এরা আমাকে একটা সেফ হাউসে তুলেছে। আমার সন্দেহ, এরা আমার টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়ে রেখেছে এবং আমার সব কথা টেপ করা হচ্ছে। এরা চিনা ভাষাও অবশ্যই জানে। সুতরাং আমি সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলছি।"

"হ্যাঁ ডক্টর ওয়াং, বুঝতে পেরেছি। আপনি কত নম্বর সঙ্কেতে কথা বলবেন?"

"চার নম্বর।"

"ঠিক আছে।"

কথা অবশ্য বেশি বললেন না ডক্টর ওয়াং। একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন। একটা সংক্ষিপ্ত জবাব এল। ওয়াং এর পর তিনটি বাক্য বললেন। একটি বাক্যে জবাব এল। ডক্টর ওয়াং এর পর মোট কুড়িটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, তার মধ্যে বারকয়েক বনি নামটা ছিল। তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন ওয়াং। তাঁর মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

ওদিকে বেসমেন্ট বা মাটির নীচেকার পাতালঘরে একটি অত্যাধুনিক শব্দধারক যন্ত্রকে ঘিরে তিনজন লোক পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। ডক্টর ওয়াং-এর সব কথাই তারা শুনেছে এবং টেপ করে নিয়েছে। একজন অন্যজনকে বলল, "জন, চার নম্বর সঙ্কেত কাকে বলে জানো?"

"না ফ্রেড, জানি না।"

"বনি নামে কাউকে চেনো?"

"না, চিনি না।"

"তোমার কি মনে হয় না যে, ডক্টর ওয়াং অত্যন্ত ধূর্ত লোক?"

"তা তো বটেই। এশিয়াবাসীদের অধিকাংশই খুব ধূর্ত। ওয়াং আরও বেশি। তবে ধূর্ত হলেও লোকটা প্রতিভাবান। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বিশ্ববিখ্যাত হতে যথেষ্ট এলেম লাগে ভাই।"

"তা তো বটেই। প্রতিভার সঙ্গে ধূতামি যোগ হলে খুবই বিপজ্জনক। অথচ লোকটাকে দেখলে হাসিই পায়।"

"আর হেসো না ফ্রেড। ডক্টর ওয়াং মোটেই হাসির খোরাক নন। আমার মনে হয় লন্ডনে ওঁর অনেক শাগরেদ আছে। যার সঙ্গে উনি কথা বললেন সেও একজন। ফোন নম্বরটা কোথাকার বলো তো?"

ফ্রেড মাথা নেড়ে বলল, "ডক্টর ওয়াং তোমার বা আমার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত জন। ফোনটা করেছেন উনি চেরিং ক্রস আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের একটি পাবলিক বুথের নম্বরে। লোকটি ওই বুথে ঢুকে অপেক্ষা করছিল। সবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল নিশ্চয়ই।"

"সে তো বটেই। বনি নামটা মনে রেখো। আমাদের জানতে হবে এই বনি কে।"

"আমাদের সবই জানতে হবে ফ্রেড!"

"কিন্তু কাজটা খুব সহজ হবে না জন।"

ওদিকে ফোন করার পর ডক্টর ওয়াং খুব খুশির ভাব দেখাচ্ছেন। তিনি গরম জলে স্নান করলেন এবং খুশির চোটে স্নান করতে করতে চিনা ভাষায় একটু গানও করলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর গানের গলা নেই।

স্নানের পর তিনি খাবার ঘরে গিয়ে দেখলেন অতি সুস্বাদু সব চিনা খাবার তাঁর জন্য সাজিয়ে রেখে সেবকেরা অপেক্ষা করছে।

সন্দেহাকুল গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "খাবারে বিষ নেই তো? বা ঘুমের ওষুধ?"

খেয়ে উঠে তিনি তাঁর ঘরে এসে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর টিভি খুলে খবর শুনতে লাগলেন। বি বি সি'র সংবাদে ডক্টর ওয়াং সম্বন্ধে খবরে বলা হল, চিন সরকার জানিয়েছেন ডক্টর ওয়াং মোটেই চিন ছেড়ে পালিয়ে যাননি। তিনি চিনেই আছেন। তাঁর পালিয়ে যাওয়ার খবরটি সম্পূর্ণ বানানো।

ডক্টর ওয়াং সামান্য হাসলেন। ধীরে ধীরে রাত্রি গম্ভীর হল। ওয়াং ঘড়ি দেখলেন। তারপর টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাইরে বেলোনোর পোশাক পরে নিলেন। অ্যাটাচি কেসটা খুলে তিনি চারটে ডটপেন বের করে তিনটে পকেটে গুঁজে রাখলেন, একটা নিলেন ডান হাতে। তারপর ঘরের আলো নিবিয়ে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন।

লিভিং রুম পেরিয়ে বাইরে বেরোনোর দরজা। দরজার বাইরে অবশ্যই পাহারাদার আছে। আছে শিকারি ককরও। সুতরাং, সেদিকে গেলেন না ওয়াং, তিনি ডানধারে একটা জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে দেখলেন। মস্ত লন। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ফ্লাড লাইটের আলোয় জায়গাটা দিনের বেলার মতোই ঝকঝক করছে।

জানালাটা খুলে ওয়াং লঘু পায়ে একটা লাফ দিয়ে নীচে। পড়লেন। কোনও শব্দ হল না বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেগে একটা ডোবারম্যান ককর ছুটে এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওয়াং দেওয়ালে সিঁটিয়ে গিয়ে কুকুরটার চেয়েও তৎপরতায় ডটপেনটা তুলে বোম টিপতেই পিং করে একটা সূক্ষ্ম উঁচ গিয়ে কুকুরটার গলায় বিঁধল। তিন সেকেন্ডের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল কুকুরটা। ওয়াং নড়লেন না। দ্বিতীয় কুকুরটা অবশ্যই আসবে।

দেড় মিনিট পর দ্বিতীয় কুকুরটা এল। নিঃশব্দে এবং চিতাবাঘের মতো মসৃণ গতিতে। ওয়াং এবার আগের চেয়ে তৎপরতায় কুকুরটিকে ঘুম পাড়ালেন। তৃতীয় কুকুরটা এল আরও দেড় মিনিট পর। তারপর এল চতুর্থ কুকুর।

চারটে কুকুরকে নিষ্ক্রিয় করে ওয়াং রুমালে কপালের ঘাম মুছে। নিলেন।

তাঁর হিসেবমতো মোট ছ’জন সশস্ত্র প্রহরী বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে। সামনের দিকে চারজন, পিছনে দুজন। ওয়াং একটা ঝোঁপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে ভাল করে চারদিকটা লক্ষ করলেন। একটা মেপল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একজন গার্ড চুয়িংগাম চিবিয়ে। যাচ্ছিল। ওয়াং পাল্লাটা মেপে নিলেন, তারপর আর-একটা ডটপেন পকেট থেকে নিয়ে তাক করলেন। পিং করে শব্দ হল। প্রহরীটা যেন একটু চমকে উঠল। ঘাড়ে হাত দিল। তারপরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এমন সময় হঠাৎ একটা বজ্রসম হাত এসে খ্যাঁক করে ওয়াং-এর ঘাড় চেপে ধরে টেনে তুলল। বিশালদেহী দ্বিতীয় পাহারাদার। ওয়াং-এর দিকে চেয়ে কর্কশ গলায় বলল, ডক্টর ওয়াং! এত রাতে লন্ডনের হাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

ওয়াং অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, “আমি কি তোমাদের কয়েদি?”

“না। তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি। সম্মানিত অতিথিরা যেমন আচরণ করে থাকেন তোমারও সেরকমই করা উচিত।”

ঝাঁকুনির চোটে ওয়াং-এর হাত থেকে ডটপেনটা পড়ে গেছে পকেটে হাত দেওয়ারও জো নেই। এরা এসব ছোটখাটো অস্ত্রের খবর রাখে। সুতরাং, এই ছ’ ফুট লম্বা দানবটির দিকে ওয়াং ভাল করে চেয়ে মাপজোখ করে নিলেন। তারপর নিরীহ হাতটি বাড়িয়ে লোকটার কবজির একটা বিশেষ জায়গা চেপে ধরলেন। অন্য হাতের একটা আঙুল অবিকল ছোরার মতো চালিয়ে দিলেন লোকটার কণ্ঠায়।

বিশাল দানবটি গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল।

ওয়াং ডটপেন এবং অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে দেওয়ালটার কাছে পৌঁছে গেলেন। তালাদেওয়া একটা ছোট্ট লোহার ফটক আছে, তালা এবং লোহার ফটক দুটোই

অতিশয় মজবুত। পকেট থেকে আর-একটা ডটপেন বের করলেন ওয়াং। বোতাম টিপতেই তা থেকে একটা সরু বিচিত্রদর্শন ইস্পাতের মুখ বেরিয়ে এল। তালা খুলে ফেলতে দশ সেকেন্ডও লাগল না। রাস্তায় পড়েই ওয়াং অতি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। অন্তত এক কিলোমিটার হেঁটে তিনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলেন সোহো অঞ্চলের এক সরু রাস্তায়। কেমন যেন গা-ছমছম করা পরিবেশ। ঘিঞ্জি সব গরিব চেহারার বাড়ি। তারই একটার সামনে এসে নামলেন ওয়াং। ডোরবেল টিপলেন। দরজা খুলে একজন বেঁটেখাটো চেহারার চিনা মাথা নিচু করে অভিবাদন করল।

বাড়ির ভিতরে গোলকধাঁধার মতো করিডোর এবং হরেক ছাঁদের সিঁড়ি। তিন তলায় পিছনের দিকে একটা ঘরে চার-পাঁচজন নানা দেশী লোক একটা কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে আছে। কম্পিউটার ছাড়া টিভি মনিটরও আছে। আছে নানা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। সকলে উঠে ওয়াংকে অভিবাদন জানাল।

ওয়াং-এর ভ্রু কোঁচকানো। ঘড়ি দেখে বললেন, "এ জায়গাটার খোঁজ পেতে ওদের তিন-চার ঘণ্টার বেশি লাগবে না। সুতরাং, হাতে সময় বেশি নেই। ভিডিও ক্যাসেটটা চালাও।"

সামনের টিভির পরদায় এন বি সি নিউজের রেকর্ড করা সংবাদটিও ফুটে উঠল। সবটা নয়। শুধু বনির অংশটা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বনিকে দেখানোও হল। সুন্দর ফুটফুটে একটা বাচ্চা। কিন্তু সম্পূর্ণ পঙ্গু।

ওয়াং বারবার রিউইন্ড করে বনির ছবি দেখলেন। সংবাদ ভাষ্য শুনলেন। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

বেঁটে লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর ওয়াং, এইটুকু একটা বাচ্চাকে নিয়ে আপনি অত দুশ্চিন্তা করছেন কেন?"

ওয়াং অত্যন্ত বিরক্তি ও রাগের সঙ্গে বললেন, "মূর্খ! বনি কে তা তোমরা জানো না। কিন্তু আমি একজন বৈজ্ঞানিক, আমি জানি। ওর চোখ দুটো ক্লোজ আপে আনো, দেখতে পাবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে কম্পিউটারের সাহায্যে বনির মুখমণ্ডল, বিশেষ করে তার চোখ দুটো সুপার ক্লোজ আপে আনা হল। চোখ দুটি প্রাণচঞ্চল, তাতে বুদ্ধিরও যেন ঝিকিমিকি।

বেঁটে লোকটা অত্যধিক বিনয়ের সঙ্গে বলল, "তা না হয় বুঝলুম। বাচ্চাটা পঙ্গু হলেও নিবোধ নয়। কিন্তু এ আমাদের কী ক্ষতি করতে পারে? এ তো একেবারে সাত আট মাস বয়সের শিশু।"

ওয়াং ঝাঁঝালো গলায় বললেন, "যা জানো না, বোঝ না তা নিয়ে কথা বোলো না। জার্সি সিটির একটা লোকাল নিউজপেপারে কী খবর বেরিয়েছে জানো? বনি বিপদ দেখলে তার চোখের রং বদলে ফেলতে পারে।"

"না, আমি এ খবর জানতাম না। চোখের রং সে কী করে বদলায়? সেটা কি সম্ভব?"

"কী করে বদলায় তা আমিও জানি না। সেইজন্যই আমি আমেরিকা যাচ্ছি। একমাত্র উদ্দেশ্য বনিকে কজা করা। নইলে বনি আমাদের অনেক ক্ষতি করতে পারে।"

"একথাটা বুঝতে পারছি না ডক্টর।"

"তুমি বোকা, তাই বুঝতে পারছ না। বনির লক্ষণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওই পঙ্গু শিশুটি এমন একটি মস্তিষ্কের অধিকারী যা যে-কোনও মেকানিক্যাল ডিভাইসের ওপর আধিপত্য করতে পারে। যখন ও আর একটু বড় হবে তখনই ওর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমি যে সুপার ব্রাট আবিষ্কার করেছি তা একটি অমিত ক্ষমতাশালী যন্ত্র। দুঃখের বিষয় সেটি কিছু বদমাশ লোক চুরি করেছে। আমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ সেটির সম্যক ব্যবহার জানে না। কিন্তু কোনও

অতি মস্তিষ্কের সংস্পর্শে এলে কী হয় তা বলা যায় না।”

এমন সময় ঘরের আর-একজন লোক বলে উঠল, “দেখুন ডক্টর ওয়াং, বি বি সি নিউজে কী বলছে।”

ওয়াং ঝুঁকে পড়লেন। বি বি সি’র নৈশ সংবাদে বলা হচ্ছে, চিন সরকার জানিয়েছেন, যুনান প্রদেশের এক জঙ্গলের মধ্যে আজ দ্বিপ্রহরে ডক্টর ওয়াং-এর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাকে গুলি করে

হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং, দেশপ্রেমী ডক্টর ওয়াং-এর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার খবরটি একেবারেই ভুল। তাঁর হত্যাকারীকে খোঁজা হচ্ছে।

ওয়াং সোজা হয়ে বসে বললেন, “আর দেরি নয়। এবার পালাতে হবে।”

সবাই নিঃশব্দে উঠে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

৪. বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে

বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে। বাবুরাম যখনই বুঝতে পারলেন, বনি নিরাপদ নয় এবং তাঁদের ওপর কিছু লোক নজর রাখছে, তখন ঘাবড়ে গেলেও তিনি হাল ছাড়লেন না। বিপদ থেকে বুদ্ধি খাঁটিয়ে উদ্ধার পেতে হবে। এবং জানতে হবে, বনির জন্মের ভিতরে কী রহস্য আছে। সুতরাং ডেলাওয়্যার ওয়াটার গ্যাপের রাস্তায় সেই দুর্ঘটনার জায়গায় যাওয়া ঠিক করলেও তিনি গোপনে যাওয়াই স্থির করলেন। নিজের গাড়িতে যাওয়া চলবে না, গাড়িটা শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই চেনে। তা ছাড়া সেই পোড়ড়া বাড়িটায় যেতে গেলে শক্তপোক্ত গাড়ির দরকার, শৌখিন গাড়ি ধকল সইতে পারবে না।

আমেরিকায় গাড়ি কেনা খুব সহজ। যে-কোনও শহরেই গাড়ির দোকানে সারি-সারি নতুন বা পুরনো গাড়ি সাজানো আছে। নগদ টাকাতেও কিনতে হবে না, ক্রেডিট কার্ডেই কেনা যায়। বাবুরাম উইক এণ্ডের আগের দিন গাড়ির ডিলারের কাছে গিয়ে খুব দেখেশুনে একটা জাপানি হোণ্ডা গাড়ি কিনলেন। জিপগাড়ির মতোই সেটার ফোর হুইল ড্রাইভের ব্যবস্থা আছে। সেলফ সিলিং টায়ার থাকার ফলে ফুটো হওয়ার ভয় নেই। পুরু ইস্পাতের পাতে তৈরি গাড়িটা খুব মজবুত। গাড়ি কিনে তিনি সেটা বাড়ি নিয়ে গেলেন না। সেটা বোকামি হবে। ডিলারকে বললেন, একটা বিশেষ জায়গায়, পার্কের ধারে যেন গাড়িটা আজ রাতের মধ্যেই রেখে আসা হয় এবং গাড়ির চাবি যেন ডিকির ভিতরে রেখে দেওয়া হয়।

আমেরিকায় গাড়ি চুরির ঘটনা খুব কমই ঘটে। আর বেশির ভাগ গাড়িই রাস্তাঘাটেই ফেলে রাখা হয়।

শনিবার বাবুরাম আর প্রতিভা সকালে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলেন। তারা একসঙ্গে বোলেন না। বাবুরাম যেন কোনও কাজে যাচ্ছেন, এমনভাবে ব্যাগট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে চলে গেলেন। আর প্রতিভা বনিকে প্যারামবুলেটারে

বসিয়ে, যেন ছেলেকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন, এমনভাবে বেরোলেন। পার্কের কাছাকাছি এসে তিনি গাড়িটা দেখতে পেলেন। চারদিকটা লক্ষ করে দেখলেন, কোনও সন্দেহজনক লোককে দেখা যাচ্ছে না। তিনি ধীরে ধীরে বনিকে নিয়ে গাড়িটার কাছে এসে ডিকি থেকে চাবিটা বের করে গাড়ির দরজা খুলে বনিকে কোলে নিয়ে উঠে পড়লেন। প্যারামবুলেটরটা পার্কে একটা ঝোঁপের ভিতরে খুঁজে দিলেন।

খুব জোরে গাড়ি চালালে পাছে কেউ সন্দেহ করে এজন্য মোটামুটি স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে তিনি নিউ ইয়র্কের রাস্তায় খানিক দূর এগোলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, একটা লোক বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লিফট চাইছে।

প্রতিভা গাড়ি থামালে বাবুরাম উঠে এলেন গাড়িতে।

এর পর রুট এইট্টি ধরে সোজা পেনসিলভানিয়ার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন প্রতিভা।

জায়গাটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছিল একটা গ্যাস-স্টেশন সাইনের দু' শো গজ দূরে, তাঁদের মনে আছে। পাশেই একজিট-অর্থাৎ হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে ছোটখাটো শহর বা পল্লী অঞ্চলে যাওয়ার রাস্তা। প্রতিভা একজিট দিয়ে হাইওয়ে থেকে নেমে এলেন। কিছু দূর গিয়েই বাঁ ধারে জঙ্গলের সেই রাস্তাটা দেখতে পেলেন।

হোণ্ডা গাড়িটা সত্যিই ভাল। জঙ্গলের রাস্তায় একটু টাল খেতে-খেতে দিব্যি চলতে লাগল। ঘুমন্ত বনিকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন বাবুরাম। হঠাৎ লক্ষ করলেন, বনি চোখ মেলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

ছেলেকে আদর করে বাবুরাম বললেন, "বনি, তুই কিছু বলতে চাস? খিদে পেয়েছে?"

বনি চেয়ে থাকা ছাড়া আর খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া আর কিছুই পারে না। তবু ওকে নিয়ে কেন যে কিছু লোকের এত মাথাব্যথা!

জঙ্গল পার হয়ে গাড়িটা একটু ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। সামনেই সেই ঝুরঝুরে পোড়ো বাড়িটা।

বাবুরাম জিজ্ঞেস করলেন, "প্রতিভা, তোমার ভয় করছে না

প্রতিভা মাথা নেড়ে বললেন, "না। ভয় কিসের? বনির জন্য আমি সব করতে পারি।"

"তা হলে এসো, বাড়িটা ভাল করে দেখা যাক। বিশেষ করে বেসমেন্টটা।"

বাবুরাম বনিকে কোলে নিয়ে নামলেন, সঙ্গে প্রতিভা। ধীরে-ধীরে তাঁরা বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের বাড়ি যেমন হয় এবাড়িটাও তেমনই। একতলায় লিভিং রুম, ড্রয়িং রুম, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর ইত্যাদি। সবই ফাঁকা। তবে রান্নাঘরে গ্যাস উনুনটা রয়েছে। ফলে জলও আছে।

তাঁরা ধীরে-ধীরে বেসমেন্ট-অর্থাৎ মাটির তলার ঘরটিতে নামলেন। ঘরটা মাটির তলায় হলেও স্কাইলাইট দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছে। বিশাল ঘর। এবং এ-ঘরটাও ফাঁকা। বাবুরাম সুইচ টিপলেন। অবাক কাণ্ড! আলো জ্বলল। তার মানে, বাড়িটার ইলেকট্রিক কানেকশন এখনও আছে।

বাবুরাম চারদিক ঘুরে দেখছিলেন। একটা ওয়েস্ট বাস্কেট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। বাবুরাম ওয়েস্ট বাস্কেটটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দেখলেন, ভিতরে দু-চারটে জিনিস রয়েছে। তার মধ্যে একটা ডিসপোজেবল ইনজেকশন, যার উঁচটা খুব লম্বা। আর লেবেলহীন কয়েকটা ইনজেকশনের অ্যামপুল। বাবুরাম জিনিসগুলি সংগ্রহ করে একটা চামড়ার ব্যাগে ভরে নিলেন।

প্রতিভাও চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন। টয়লেটটা দেখতে ঢুকলেন প্রতিভা। টয়লেটেও একটি ওয়েস্ট বাসকেট রয়েছে। প্রতিভা দেখলেন তার মধ্যে কিছু টুকরো কাগজ। তিনি টুকরোগুলো বের করলেন। দু-চারটে ব্যবহৃত টিসু পেপার। আর ভেঁড়া একটা কার্ড।

কার্ডের চারটে টুকরো জুড়লেন প্রতিভা। একটা ক্লিনিকের বিজ্ঞাপন। ডক্টর লিভিংস্টোনস ক্লিনিক, পোর্টল্যান্ড, পেনসিলভানিয়া।

তিনি বাবুরামকে কার্ডটা দেখালেন। বাবুরাম সেটাও ব্যাগে ভরে নিলেন। বললেন, "আর তো কিছু দেখার নেই দেখছি।"

প্রতিভা চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "হয়তো আছে। কিন্তু আমরা তো আর ডিটেকটিভ নই।"

হতাশ হয়ে দু'জনে ওপরে উঠে এলেন। আর উঠেই শুনতে পেলেন জঙ্গল ভেদ করে একটা শক্তিশালী মোটরবাইক এগিয়ে আসছে। সম্ভবত তাঁদের দিকেই।

প্রতিভার মুখ শুকনো, "শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। চলো, গাড়িতে উঠে পড়া যাক।"

প্রায় দৌড়ে গিয়ে তাঁরা দু'জন গাড়িতে উঠলেন। বাবুরাম বনিকে প্রতিভার কোলে দিয়ে বললেন, "এবার আমি চালাব। তুমি মাথা নিচু করে বসে থাকো।"

"মাথা নিচু করব কেন?"

"যদি গুলি-টুলি চালায়। ওরা কেমন লোক তা তো জানি না।"

প্রতিভা তাই করলেন। বাবুরাম গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে-না-নিতেই ভীমবেগে প্রকাণ্ড একটা মোটরবাইক জঙ্গল ফুড়ে ফাঁকা জায়গাটায় পড়েই ব্রেক কষল। বাইকে দু'জন লোক। দু'জনেরই মাথায় কপাল-ঢাকা টুপি, চোখে প্রকাণ্ড গগলস। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা গেল, একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ। দু'জনেরই বিশাল চেহারা। তাদের গাড়িটা দেখেই একজন চেঁচিয়ে ইংরিজিতে বলল, "ওই তো ওরা! রোখো ওদের।"

জঙ্গলের রাস্তাটা সরু। মোটরবাইকটা টক করে ঘুরে গিয়ে পথটা আটকানোর চেষ্টা করল। বাবুরাম তার আগেই গাড়িটা চালিয়ে দিয়েছেন। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের তফাতে বাবুরাম বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু বেরিয়ে গিয়েও ওদের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। সরু রাস্তায় গাড়ির চেয়ে মোটরবাইক অনেক বেশি সচল। সুতরাং বাইকটা গর্জন করতে-করতে পিছু নিয়ে ধেয়ে এল।

প্রতিভা আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "ওরা পিছু নিয়েছে কেন? কী চায় ওরা?"

বাবুরাম দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ওরা ভেবেছে আমরা বনিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। যতদূর মনে হচ্ছে ওরা আমাদের আটকাতে চাইছে।"

বলতে বলতেই একটা গুলির শব্দ হল। বাবুরাম আয়নায় দেখলেন, বাইকের পিছনে বসা লোকটার হাতে একটা বিপজ্জনক আগ্নেয়াস্ত্র গুলিটা কোথায় লাগল কিংবা লাগল না, তা বুঝতে পারলেন না বাবুরাম। তবে তিনি গাড়িটা যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে চালাতে লাগলেন।

পর-পর কয়েকবার গুলির আওয়াজ হল। প্রতিভা বনিকে বুকে চেপে উপুড় হয়ে ছিলেন। বললেন, "তোমাকে যে ওরা মেরে ফেলবে।"

বাবুরাম বললেন, "বোধ হয় পারবে না। মনে হচ্ছে গাড়ির কাঁচগুলোও বুলেটপ্রুফ। ঠাকুরকে ডাকো প্রতিভা।"

হোণ্ডা গাড়িটা লাফিয়ে লাফিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে চলছে, কিন্তু মোটরবাইকটাও সমানে পাল্লা দিচ্ছে। এভাবে রেস দিয়ে কতক্ষণ পারা যাবে? বাবুরাম এ-ও জানেন, পালাতে পারলেও লাভ নেই। এরা গিয়ে এদের দলকে জানাবে এবং তাঁর গাড়ি খুঁজে বের করতে ওদের অসুবিধে হবে না। বিশেষ করে বাবুরামের পালিয়ে থাকার জায়গা

নেই। সুতরাং তিনি মাথা খাটাতে লাগলেন। যেমন করেই হোক এদের নিষ্ক্রিয় করা দরকার।

জঙ্গল সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে-মাঝে ফাঁকা জায়গাও আছে। সামনে এরকম একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে বাবুরাম দাঁতে দাঁত চেপে তৈরি হলেন। এখন তাঁকে একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে হবে। এরকম কাজ তিনি জীবনে কখনও করেননি। তবে আত্মরক্ষার জন্য এ ছাড়া আর পথও নেই।

বাবুরাম চাপা স্বরে বললেন, “প্রতিভা, ভয় পেও না। বনিকে খুব শক্ত করে চেপে ধরে থাকো, আর নিজেও সাবধান হও। একটা ঝাঁকুনি লাগতে পারে।”

ফাঁকা জায়গাটার চারধারে বিশাল বিশাল গাছ। বাবুরাম ফাঁকায় পড়েই বাঁ দিকে বাঁক নিলেন। গাড়িটা বোধ হয় খানাখন্দে পড়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু থামল না। বাবুরাম অ্যাকসেলেটরে প্রবল চাপ দিয়ে স্টিয়ারিং ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আচমকা বাঁক নিয়ে গাড়িটা উলটো মুখে ঘুরে যেতেই বাবুরাম দেখলেন মোটরবাইকটা লাফাতে লাফাতে ফাঁকায় এসে পৌঁছেছে। বাবুরাম আর দেরি করলেন না। সোজা গাড়িটা চালিয়ে দিলেন মোটরবাইকটার দিকে।

প্রবল একটা ধাতব সংঘর্ষের শব্দ হল। দু’জন লোক ছিটকে এবং খানিকটা উড়ে গিয়ে দু’ধারে পড়ল। মোটরবাইকটা একটা ডিগবাজি খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে গেল।

বাবুরাম গাড়ি থামালেন।

প্রতিভা সাদা মুখে বললেন, “কী হল?”

“যা হওয়ার হয়ে গেছে। তোমরা ঠিক আছ?”

“আছি।”

বাবুরাম গাড়ি থেকে নামলেন। শ্বেতাঙ্গ লোকটার মাথা একটা গাছের গুঁড়িতে লেগে থেতলে গেছে। লোকটা মরেনি বটে, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে আছে। প্রচর রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর উইনচিটার। কালোলোকটার অবস্থা খুবই খারাপ। ওর পিস্তলের নল গলায় ঢুকে গেছে। লোকটার ঘাড়ও মনে হল ভাঙা।

বাবুরাম ঘামছিলেন। তাঁর বমি পাচ্ছিল। বিবর্ণ মুখে ফিরে এসে গাড়িতে বসে তিনি বললেন, "প্রতিভা, একটা লোককে আমি মেরে ফেলেছি। অন্যটার কথা বলতে পারছি না।"

প্রতিভা সোজা হয়ে বসে বললেন, "যা করেছ সে তো ইচ্ছে করে নয়। না মারলে ওরাই আমাদের মারত। তোমাকে আর গাড়ি চালাতে হবে না। বনিকে নিয়ে বোসো। আমি গাড়ি চালাচ্ছি।"

বাবুরামের হাত পা থর-থর করে কাঁপছে। পাংশুমুখে তিনি বললেন, "আমাদের কি উচিত নয় ওদের হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া?"

প্রতিভা মাথা নেড়ে কঠিন গলায় বললেন, "হাসপাতালে পৌঁছে। দিলে আমাদের অনেক জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে।"

"এভাবে পড়ে থাকলে ওরা এমনিতেই মরে যাবে প্রতিভা।"

প্রতিভা একটু ভাবলেন। বিপদে পড়লে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মাথাই বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, "ডক্টর লিভিংস্টোনের ক্লিনিককে ফোন করলে কেমন হয়। পোর্টল্যাণ্ড শহরটা এখান থেকে খুব কাছে।"

বাবুরাম মাথা নেড়ে বললেন, "সেটা তবু ভাল।"

প্রতিভা গাড়ি চালাতে লাগলেন। বনিকে কোলে নিয়ে বসে বাবুরাম নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে। কষ্ট প্রতিভারও হচ্ছে। দু-দুটো লোককে ওভাবে

জখম করা তো সোজা নিষ্ঠুর কাজ নয়। কিন্তু প্রতিভার বাস্তববোধ বেশি। তিনি জানেন এ ছাড়া উপায় ছিল না।

গ্যাস স্টেশনটায় এসে প্রতিভা গাড়ি থামিয়ে তেল ভরে নিতে লাগলেন। বাবুরাম গিয়ে ডক্টর লিভিংস্টোনের ছেঁড়া কার্ডটা বের করে ফোন নম্বর দেখে ডায়াল করলেন।

একজন মহিলা ফোন তুলে বললেন, “ডক্টর লিভিংস্টোনের ক্লিনিক।”

বাবুরাম কাঁপা গলায় বললেন, “ম্যাডাম, জঙ্গলের মধ্যে দুটো লোক সাঙ্ঘাতিক আহত, ওদের সাহায্য দরকার।”

“কোন জঙ্গল?”

বাবুরাম কাঁপা গলাতেই কোনওরকমে জায়গাটার বিবরণ দিলেন।

“কীরকম অ্যাকসিডেন্ট?”

“খুব গুরুতর। ওদের মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার। ওদের মোটরবাইক.... ”।

বাবুরাম হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন। হঠাৎ মেয়েটির গলা তীক্ষ্ণ শোনাল, “আপনি কে বলছেন?”

“আমার নাম বাবুরাম গাঙ্গুলি।”

“ওঃ।” বলে মেয়েটি এমনভাবে চুপ করে গেল যেটা বেশ সন্দেহজনক মনে হল বাবুরামের।

“আপনারা কি ব্যবস্থা নেবেন?”

মেয়েটি হঠাৎ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, “এই ক্লিনিকের ফোন নম্বর আপনাকে কে দিল মিস্টার গাঙ্গুলি?”

“একটা গ্যাস স্টেশনের টেলিফোন ডিরেক্টরিতে।” বাবুরাম কোনওরকমে বানিয়ে বললেন।

“ঠিক আছে মিস্টার গাঙ্গুলি, আমাদের অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে। আপনি। স্পটের কাছে হাইওয়েতে অপেক্ষা করুন।”

“আচ্ছা।” বলে বাবুরাম ফোন ছেড়ে তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠলেন। বনিকে সিট থেকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, “প্রতিভা, তাড়াতাড়ি করো। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওই ক্লিনিকটা খুব সুবিধের নয়।”

প্রতিভা প্রশ্ন না করে গাড়ি ছেড়ে দিলেন। একটু এগিয়ে গিয়েই তিনি একটা একজিট ধরে হাইওয়ে থেকে নেমে অনেকটা ঘরে উলটো দিকের পথ ধরতে আবার হাইওয়েতে উঠে এলেন।

বাবুরাম চোখ বুজে ছিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, “বাড়িতে ফিরে যাওয়াটাও এখন নিরাপদ হবে কি না কে জানে!”

“প্রতিভা দৃঢ় গলায় বললেন, “ভয় নেই, আমরা বাড়ি যাচ্ছি না। ”

“তা হলে কোথায়?”

জার্সি শহরের একটু বাইরের দিকে কয়েকটা পুরনো গুদামঘরের একটা সারি আছে। এখানে কিছু ভবঘুরে আস্তানা গেড়ে আছে। পুলিশ মাঝে-মাঝে এসে জায়গাটা তল্লাশ করে যায়। প্রতিভা সোজা এসে গুদামঘরের চত্বরে গাড়ি থামালেন।

প্রথমে দু-চারটে বাচ্চা ছুটে এল। পিছনে এক বুড়ি। এরা খুব সন্দিহান স্বভাবের লোক। উগ্রও বটে। ভ ভদ্রলোকদের এরা একদম পছন্দ করে না।

বুড়ি একটু এগিয়ে এসে বলল, “কী চাই?”

প্রতিভা জিজ্ঞেস করলেন, “ফ্রেড কোথায়?”

“তোমরা কি পুলিশের লোক?”

“না। ফ্রেডকে এবং তার দলবলকে বলল, আমি বনিকে নিয়ে এসেছি। আমার সাহায্য চাই।”

এই কথাবার্তার মাঝখানেই বিভিন্ন দরজা দিয়ে কয়েকজন নোংরা চেহারার মেয়ে আর পুরুষ বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের চেহারাতেই একটা উগ্র ভাব।

বনিকে কোলে নিয়ে বাবুরাম নেমে চারদিকে চেয়ে বললেন, “এ কোথায় নিয়ে এলে প্রতিভা? এ যে ভবঘুরেদের আস্তানা। এরা ভয়ঙ্কর লোক”।

প্রতিভা মৃদুস্বরে বললেন, “এখন এ ছাড়া উপায় নেই।”

মেয়ে পুরুষগুলো এগিয়ে এসে তাঁদের একরকম ঘিরে ফেলল। হঠাৎই তাদের মধ্যে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “এ তো সেই বাচ্চাটা! এই তো সেই দেবশিশু! দ্যাখো, দ্যাখো, ওর চোখের রং পালটে যাচ্ছে!”

বাবুরাম আর প্রতিভাও দেখলেন। বনির কালো চোখ হঠাৎ নীলকান্তমণি হয়ে উঠেছে। যেন আলো বেরিয়ে আসছে চোখ দিয়ে।

সকলে খানিকক্ষণ পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বনির দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একে-একে হাঁটু গেড়ে বসে ভূমি চুম্বন করল। সেই বুড়িটা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, “তোমাদের আমরা কী সাহায্য করতে পারি?”

প্রতিভা সংক্ষেপে বললেন, “শোনো, বেশি কথা বলার সময় নেই। কিছু দুষ্টু লোক আমাদের ছেলেটাকে চুরি করতে চায়। তারা আমাকে আর আমার স্বামীকে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে। আমরা ভারতবর্ষে চলে যেতে চাই। তোমরা আমাদের সাহায্য করবে?”

একজন পুরুষ বলল, “অবশ্যই করব। কী করতে বলল?”

“আমাদের বাড়ির ওপর ওরা নজর রেখেছে। আমাদের সেখানে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের পাশপোর্ট চাই, প্লেনের টিকিট চাই। সবই আমাদের বাড়ির মধ্যে রয়েছে।”

পুরুষটি একটু হাসল, “ওটা কোনও ব্যাপার নয়।”

প্রতিভা বলল, “টিকিট বা পাশপোর্ট বের করে আনা বিপজ্জনক হবে। ওরা খুব খারাপ লোক খুনখারাপিও করতে পারে।”

বুড়িটা বলল, “ভেবো না বাছা। আমরা অনেক সুলুকসন্ধান। জানি। একটা বাড়িতে ঢুকে কী করে জিনিস বের করতে হয় তা আমাদের বাচ্চারাও জানে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।”

প্রতিভা বললেন, “আমাদের এই গাড়িটাও লুকিয়ে ফেলা দরকার। এটা ওরা বোধ হয় চিনে ফেলেছে!”

বাবুরাম অবাক হয়ে বললেন, “কী করে?”

“যে গ্যাস স্টেশনে আমরা তেল ভরেছি সেখানেও ওরা খোঁজ নেবে এবং উভেড লোক দুটোও বলে দিতে পারে। সাবধানের মার নেই।”

বাবুরাম গলা চুলকে বললেন, “তা বটে। বিপদে তোমার বুদ্ধি খোলে। কিন্তু আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে।”

“ঘাবড়াবার কিছু নেই। এরা বনিকে দেবশিশু বলে ধরে নিয়েছে। এরা ওকে বাঁচাবেই।”

“কিন্তু দেশে ফিরতে হলে আমাদের টাকা চাই। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার কী হবে? আজ যে ব্যাঙ্ক বন্ধ। সেই সোমবার খুলবে।”

"ওটা নিয়ে ভেবো না। দেশে যেতে আমাদের সামান্য টাকা লাগবে। শুধু এয়ারপোর্টে যাওয়ার যেটুকু খরচ। আমার ব্যাগে পাঁচশো ডলার আছে। যথেষ্ট। দেশে গেলে টাকার তো অভাব হবে না।"

বাবুরাম তবু বললেন, "লাগেজ? আমাদের সঙ্গে তো জিনিসপত্র কিছুই নেই।"

"লাগবে না। তুমি বনিকে আমার কাছে রেখে কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে প্যান অ্যাম-এর কাছে খোঁজ করে দ্যাখো আজকের ফ্লাইটে দুটো সিট পাওয়া যায় কি না। যদি ভারতবর্ষের টিকিট না পাওয়া যায় তা হলেও ক্ষতি নেই। আমরা ইউরোপ পৌঁছতে পারলেও হবে। সেখানে দু'দিন অপেক্ষা করে দেশে ফিরবার ব্যবস্থা করব।"

বাবুরাম এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

পুরুষটি এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ। তা জানতে পারি?"

প্রতিভা লোকটাকে তাঁদের সমস্যার কথা বুঝিয়ে বললেন।

লোকটা মন দিয়ে শুনে বলল, "নো প্রবলেম। তোমাদের কিছু জামাকাপড় আমি একটা স্যুটকেসে ভরে নিয়ে আসব। আলমারির চাবি দাও, ডলারও বের করে আনব। আমি তোমাদের গাড়িটা নিয়েই যাচ্ছি। গাড়িটা আমি ফিরিয়ে আনব না। আর যদি কাউকে টেলিফোন করতে চাও তো ওই যে ল্যাম্পপোস্টটা দেখছ ওর পরেই বাঁ ধারে পাবলিক টেলিফোন পাবে।"

লোকটা গাড়ি নিয়ে চলে গেল। বাবুরাম গেলেন টেলিফোন করতে। দুরুদুরু বুকে প্রতিভা ভবঘুরেদের সঙ্গে তাদের নোংরা ঘরে গিয়ে বনিকে নিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রায় এক ঘন্টা বাদে বাবুরাম ফিরে এসে বললেন, "প্যান অ্যাম-এর দিল্লি ফ্লাইটে দুটো সিট পাওয়া গেছে।"

প্রতিভা চিন্তিত মুখে বললেন, "এখন ভালয়-ভালয় প্লেনে উঠতে পারলে হয়"।

বুড়িটা এসে তাদের সামনে দুটো প্লাস্টিকের প্লেটে কিছু খাবার রেখে বলল, "শোনো বাছারা, যদি দুষ্ট লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হয় তা হলে ওরকম বাবু বিবির মতো পোশাক পরলে চলবে। এই আমাদের মতো উলোঝুলো পোশাক আর উইগ চাই।"

ওরকম নোংরা পোশাক পরার প্রস্তাবে বাবুরাম নাক সিটকোলেন। কিন্তু প্রতিভা বললেন, "আমরা ওই পোশাকই পরব বুড়িমা, আমাদের জোগাড় করে দাও।"

বুড়ি নির্বিকার মুখে বলল, "আমাদের দুটো বুড়োবুড়ি সেদিন মারা গেছে। ওই মেপল গাছটার তলায় তাদের পুঁতে দিয়েছি। তাদের একজোড়া পোশক আমার কাছে আছে। অন্য কেউ হলে পোশাক দুটোর জন্য অন্তত পাঁচ ডলার নিতুম। তোমাদের কাছ থেকে নেব না। তোমরা বনির মা বাবা কি না।"

বুড়ি পোশাক দুটো এনে দিল। একজোড়া পরচুলাও। পোশাক বলতে অত্যন্ত ময়লা একটা ঘন নীল রঙের কোট আর তাপ্পিমারা ট্রাউজার্স, একটা বেঢপ কামিজ আর জিনসের প্যান্ট।

বাবুরাম পোশাক দেখে বিবর্ণ হলেন ঘেন্নায়। প্রতিভা চাপাস্বরে বললেন, "বাঁচবার জন্য সব কিছু করতে হয়। ঘেন্না পেলে চলবে না।"

.

বাবুরামের বাড়ি থেকে অন্তত আধ মাইল দূরে হোন্ডা গাড়িটা একটা লেন-এর মধ্যে নিয়ে গেল মাইক-অর্থাৎ ভবঘুরে পুরুষটি। তারপর একটা আজঙ্গল জায়গায় গাড়িটা ঢুকিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হল। সমস্ত অঞ্চলটা মাইকের নখদর্পণে। কাজেই বড় রাস্তা ছেড়ে নানা ছোটখাটো বাজে-রাস্তা পেরিয়ে সে বাবুরামের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে চারদিকটা

ভাল করে লক্ষ করল। এমনিতেই শহর দিনের বেলায় জনশূন্য থাকে। তবে আজ উইক এন্ড শুরু হয়েছে বলে অনেকে ঘরের কাজ করতে বাড়িতে রয়েছে।

সন্দেহজনক কিছু না দেখে মাইক রাস্তাটা পেরিয়ে বাবুরামের দরজায় উপস্থিত হল। ভবঘুরেরা ভিক্ষে-টিক্ষে চেয়ে বেড়ায়, সুতরাং তাকে চট করে কেউ সন্দেহ করবে না। মাইক চারপাশটা দেখে নিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করল। কাঠ আর কাঁচের দরজা। খোলা শক্ত নয়। সাধারণ তালা। কেউ লক্ষ রাখছে কি না আড়াল থেকে কে জানে। সুতরাং ডোরবেলটা বারকয়েক বাজানোই ভাল। নজরদার তা হলে বুঝবে যে, সে ভিক্ষে চাইতেই এসেছে।

কিন্তু ডোরবেল বাজাতেই মাইক অবাক হয়ে দেখল, দরজাটা খুলে গেল। দরজা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা শ্বেতাঙ্গ। বজ্রগম্ভীর গলায় লোকটা বলল, "কী চাও?"

মাইক ঘাবড়ে যাওয়ার মানুষ নয়। মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, "রুটিটুটি কিছু আছে?"

"দূর হও!" বলে লোকটা দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল।

"দাঁড়াও।" বলে মাইক তার জুতো দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে সেটা আটকাল।

দৈত্যাকার লোকটা বিভীষণ মুখে মাইকের দিকে তাকিয়ে তার দুঃসাহস দেখছিল।

মাইক বলল, "আমি খবর এনেছি। বনির খবর।"

লোকটা দরজা খুলে বিনা বাক্যব্যয়ে মাইকের কোটের কলার ধরে প্রায় ইঁদুরছানার মতো তুলে ঘরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। "বনির খবর তুমি জানো? বলল কী খবর, বনি কোথায় আছে?"

লোকটা তার কলার ছাড়েনি। এরকম শক্তিশালী লোকের পাল্লায় এর আগে কখনও পড়েনি মাইক। সে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "বলছি বলছি। কিন্তু আমি কী পাব?"

"পাবে! বলেই লোকটা তাকে শূন্যে তুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর একটা ভারী পা তুলে দাঁড়াল, নোংরা নেশাখোর, চোর, বাউণ্ডুলে, তোমাকে যে খুন না করে ছেড়ে দেব সেটাই বড় পাওনা বলে জেনো। এখন ঝেড়ে কাসো তো বাছাধন, বনি কোথায়?"

মাইক বুঝল, এই দৈত্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত হবে। শুধু এ লোকটাই নয়, আড়চোখে সে দেখতে পেল, আরও দুটো লোক লিভিংরুমের দরজার কাছে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে। তাদের চেহারা ভাড়াটে খুনির মতোই। এরকম বিপদে পড়তে হবে জানলে সে বোকার মতো কিছুতেই ডোরবেল বাজাত ভারী পায়ের চাপে বুকের পাঁজরা মড়মড় করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে মাইকের। সে চি-চি করে বলতে চেষ্টা করল, "বনিকে দিয়ে তোমরা কী করবে? সে দেবশিশু।"

"সে খবরে তোর কী দরকার? সোজা কথায় জবাব দে, বনি কোথায়? তার মা বাবাকেও আমরা চাই। বাবুরাম আর তার বউ দুই শয়তান আমাদের আদেশ অমান্য করেছে, ওদের বেঁচে থাকবার অধিকার নেই।"

বুটের নিষ্পেষণে মাইকের বুকে এত যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, সে আর বেশিক্ষণ চেতনা ধরে রাখতে পারবে না।

বাবুরামের বাড়ির অভ্যন্তরে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন বাড়ির বাইরে আরও একটি ঘটনা দানা বাঁধছে। বাড়ির অনতিদূরেই অনেকক্ষণ ধরে একটি ছোট গাড়ি পার্ক করা আছে। গাড়ির কাঁচ স্বচ্ছ বলে ভিতরটা দেখা যায় না। বাতানুকুল গাড়ির অভ্যন্তরে দু'জন মানুষ পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে অনেকক্ষণ। তারা দেখেছে, একজন ভবঘুরে এল এবং তাকে অত্যন্ত কর্কশভাবে টেনে নেওয়া হল ভিতরে।

দু'জনের একজন বেঁটেখাটো ডক্টর ওয়াং। তিনি হঠাৎ মৃদুস্বরে বললেন, "যতদূর মনে হচ্ছে, বাড়ির ভিতরে আসল লোকেরা নেই। কিছু অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়েছে। আর ওই ভবঘুরেটা, নাঃ, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে লি চিং।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব কি?"

ওয়াং মাথা নেড়ে বললেন, "কক্ষনো নয়। আমেরিকায় আমার লোকবল সামান্য। তোমার কিছু হলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব।"

"কিন্তু আপনার যদি কিছু হয় ডক্টর ওয়াং?"

ওয়াং মাথা নাড়লেন, "বর্বররা কখনওই আমার ক্ষতি করতে পারে না। জীবনে আমি অজস্র বিপদে পড়েছি। তুমি সতর্ক সজাগ হয়ে বাড়িটার ওপর নজর রাখো। আমাকে ভিতরে ঢুকতে হবে।"

ওয়াং গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ডোরবেল টিপলেন।

দু সেকেণ্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল। একজন ছিপছিপে লম্বা বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের মতো চেহারার লোক দরজার সামনে দাঁড়াতেই ওয়াং মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে একগাল হেসে বললেন, "সেই ওয়াণ্ডার চাইল্ড বনিকে দেখতে এসেছি আমি।"

"আপনি কে?"

"ডক্টর ওয়াং-একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ এবং ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ।"

"বনি এখন নেই। ওরা বেড়াতে গেছে।"

ওয়াং ফের অভিবাদন করে বললেন, "আমি জানি কৌতূহলী মানুষেরা আপনাদের বিরক্ত করে। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আমি যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি। শিশুটিকে পাঁচ মিনিট পরীক্ষা করতে দিলে আমি তার জন্য পাঁচশো ডলার দিতে প্রস্তুত।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে বলল, "আগে পাঁচশো ডলার দাও, তারপর দেখব কী করা যায়।"

"অবশ্য, অবশ্য।" বলে ওয়াং হিপ-পকেট থেকে যে নোটের তাড়াটা বের করলেন তাতে একশো ডলারের নোটে অন্তত হাজার-দশেক ডলার আছে। অত্যন্ত অমায়িকভাবে ওয়াং পাঁচখানা নোট লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, "আমি ধন্য।"

লম্বা লোকটা দরজাটা আর-একটু ফাঁক করে ধরে বলল, "চলে আসুন।"

ওয়াং ঘরে ঢুকতেই একটা হোঁচটের মতো খেলেন। তাঁর মনে হল, ঠিক হোঁচট এটা নয়, ওই লোকটাই তার জুতোর ডগায় একটু ঠোক্কর মারল।

লোকটা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সামনের দৃশ্যটা দেখে ওয়াং-এর যেন মুখ শুকিয়ে গেল। হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "এ কী? এসব কী হচ্ছে এখানে! অ্যাঁ!"

দৈত্য-চেহারার লোকটা মাইকের বুক থেকে পা নামিয়ে ওয়াং-এর দিকে ফিরে বলল, "এ লোকটা চোর।"

ওয়াং পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন, "চোর! চোর খুবই খারাপ জিনিস।"

প্রকাণ্ড লোকটা হাত বাড়িয়ে ওয়াং-এর সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "এই বিশ্রী ব্যাপারটা তোমাকে দেখতে হল বলে দুঃখিত ডক্টর ওয়াং। আমার নাম জন স্মিথ।"

ওয়াং খুব অমায়িক গলায় বললেন, "আপনার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলাম মিস্টার স্মিথ। কিন্তু আমি সেই অদ্ভুত শিশুটিকে দেখতে চাই।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ডক্টর ওয়াং। আগে এই চোরটার একটা ব্যবস্থা করে নিই।"

ওয়াং মেঝেয় আধমরা হয়ে পড়ে থাকা মাইকের দিকে তাকালেন। লোকটা ভবঘুরে। ওয়াং খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এ লোকটার অপরাধ কী? ও কী করেছে?"

মাইক নিজের বুক চেপে ধরে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও, বনি কোথায় আছে আমি জানি না, টাকার লোভে মিথ্যে কথা বলেছিলুম।"

দৈত্যাকার লোকটা একটা রবার হোসের টুকরো জ্যাকেটের তলা থেকে বের করে সজোরে মাইকের গালে বসিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মাইক যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিউরে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওয়াং অত্যন্ত নাভাস হয়ে বললেন, "আমি...আমি কোনও নিষ্ঠুর দৃশ্য সহ্য করতে পারি না। আমার শরীর অস্থির লাগছে..."

সেই লম্বা নোকটা পিছন থেকে এসে ওয়াং-এর কাঁধে হাত রেখে বলল, "আপনি বসুন ডক্টর ওয়াং।"

একরকম চেপেই সে ওয়াংকে সোফায় বসিয়ে দিল। ওয়াং টের

পেলেন, বসানোর সময় তাঁর হিপ পকেট থেকে লোকটা ডলারের বান্ডিলটা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তুলে নিল।

ওয়াং বসে রুমালে কপাল মুছলেন। তারপর রুমালটা বুক পকেটে রাখলেন। তাঁর কুশলী হাতে পকেট থেকে একটা ডটপেন উঠে এল।

ওয়াং কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "মিস্টার জন স্মিথ, আমি একটু জল খেতে চাই।"

স্মিথ তাঁর সামনে এসে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে বলল, "নিশ্চয়ই ডক্টর ওয়াং। এই টম, একটু জল আনো।"

টম জল আনতে গেল। স্মিথ ওয়াং-এর দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর কী হল তা স্মিথ কখনও বলতে পারবে না। পিং করে একটা মৃদু শব্দ সে শুনল। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

তিন নম্বর লোকটা লিভিং রুমে টিভি চালিয়ে কোনও প্রোগ্রাম দেখছিল। ওয়াং নিঃশব্দে লিভিং রুমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। লোকটা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। বলাটা আর হয়ে উঠল না তার। একটা ছোট্ট ছুঁচ গিয়ে সোজা তার মুখগহ্বরে ঢুকে গেল।

টম জল নিয়ে রান্নাঘর থেকে শিস দিতে দিতে ফিরে আসছিল। আচমকাই ঘাড়ে একটা সূক্ষ্ম ব্যথা টের পেল সে। জলের গেলাসটা পড়ে গেল হাত থেকে। তারপর সেও পড়ল।

ওয়াং আর দেরি করলেন না। বাড়িটা ঘুরে দেখে নিলেন। বুঝলেন, বনি ও বাড়িতে তো নেই-ই, সম্ভবত কারও ভয়ে ওরা পালিয়েছে।

ওয়াং আগে গুন্ডাদের পকেট থেকে তাঁর ডলারগুলো বের করে নিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে মাইকের পরিচর্যা করতে বসলেন। তার বুকে আর কপালে অত্যন্ত কুশলী হাতে কিছুক্ষণ মাসাজ করার পর মাইক ধীরে ধীরে চোখ খুলল। চোখে আতঙ্ক।

ওয়াং বললেন, "কোনও ভয় নেই।"

"ওরা কোথায়?"

ওয়াং হেসে বললেন, "ঘুমোচ্ছে। ওই দ্যাখো কী নিশ্চিন্ত ঘুম!"

মাইক উঠে বসল। যেন গ্রহান্তরের জীব দেখছে এমনভাবে ওয়াং-এর দিকে হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "তুমি এই তিনটে দানবের মহড়া একা নিয়েছ! তাজ্জব। তোমাকে তো এরা মশামাছির মত টিপে মেরে ফেলতে পারে।"

ওয়াং খুব অমায়িকভাবে বলল, "দুর্বলের ভগবান আছেন। আর আছে ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি এবং কৌশল। এখন ওঠো। এখানে থাকা আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

"দাঁড়াও। আমার কিছু কাজ আছে।"

এই বলে মাইক টপ করে উঠে সোজা দোতলায় শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাবার্ড থেকে নির্দিষ্ট অ্যাটাচি কেস এবং বাক্স থেকে টাকার একটা বান্ডিল বের করে নিল। তারপর নেমে এসে বলল, "আমি যাচ্ছি। তোমাকে ধন্যবাদ।"

ওয়াং নিচু হয়ে অভিবাদন করে বললেন, "মাননীয় মহাশয়, তুমি অবশ্যই যেতে পারে। কিন্তু তোমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যই জানাতে চাই যে, আমি খুব ভাল লোক। আমি এদের মতো বদমাশ নই। আর তোমাকেও গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে কিছু চুরি করে পালাতে দিতে পারি না।"

মাইক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমি চুরি করছি না।"

"তোমার হাতে একটা অ্যাটাচি কেস দেখতে পাচ্ছি। ওটা তোমার নয়। কারণ তোমার পোশাকটোশাক বা চেহারার সঙ্গে ওই দামি জিনিসটা মানাচ্ছে না।"

মাইক নিরুপায় হয়ে বলল, "এটা এ বাড়ির মালিকের জন্যই নিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো।"

"বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। প্রমাণ কী?" মাইক সন্দিহান চোখে লোকটাকে নিরিখ করে বলল, "তোমাকে বলা যাবে না।"

"তা হলে তোমাকেও ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।"

মাইক বিপন্ন হয়ে চোখ মিটমিট করে বলল, "ওরা খুব বিপদে পড়েছে। কিছু দুষ্ট লোক ওদের খুন করে ওদের বাচ্চাটাকে চুরি করতে চাইছে।"

ওয়াং মাইকের কাঁধে হাত রেখে বলল, "পাঁচশো ডলার পেতে তোমার কেমন লাগবে?"

"খুব ভাল। কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।"

"বিশ্বাসঘাতকতা করার দরকার হলে আমি তোমার মুখ থেকেই জোর করে কথা বের করতে পারতুম। মনে রেখো ডক্টর ওয়াং একজন জিনিয়াস। আমার কাছে এমন জিনিস আছে যা দিয়ে তোমাকে অবশ বিহ্বল করে কথা বের করতে পারি। কিন্তু আমি সেরকম লোক নই।"

"তোমাকে বিশ্বাস করি কী করে?"

"করলে ঠকবে না। বনি নামক বাচ্চাটির যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে তা আমি জানি। আমি তাকে একবার দেখব বলে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে অনেক কষ্ট করে ছুটে এসেছি। যতদূর অনুমান করছি এইসব বদমাশদের ভয়ে বনিকে নিয়ে তার মা বাবা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং তুমি তাদের সাহায্য করছ। খুব ভাল কথা। আমার মনে হয় সেটাই উচিত। তবে একটুক্ষণের জন্য হলেও বনিকে আমি দেখতে চাই।"

মাইক দ্বিধায় পড়লেও বুঝল, এ-লোকটাকে এড়ানো সহজ হবে। লোকটা ভয়ঙ্কর ধূর্ত। তবে মাইককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে বলে মাইক খানিকটা কৃতজ্ঞও বোধ করছিল। দোনোমোনো করে সে বলল, "দ্যাখো, তোমাকে আমি নিয়ে যেতে রাজি। কিন্তু আমাদের ডেরায় ঢুকে কোনওরকম বেগড়বাঁই করলে কিন্তু আমরা সবাই মিলে তোমাকে ঢিট করে দেব।"

ওয়াং আবার প্রাচ্য রীতিতে অভিবাদন করে বলেন, "কথা দিচ্ছি বনির কোনও ক্ষতি আমরা করব না। আমি ভাল লোক।"

মাইক অগত্যা ওয়াং-এর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তার ছোট্ট গাড়িটায় উঠল। সতর্কতার জন্য ওয়াং-এর নির্দেশে গাড়িটি নানা ঘুরপথে চালানো হল কিছুক্ষণ। তারপর ওয়াং বললেন, "নাঃ, কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না। মাইক, এবার তুমি তোমার ডেরার পথ দেখাও।"

.

মাইককে গাড়িতে চেপে অন্য লোকের সঙ্গে ডেরায় আসতে দেখে ভবঘুরেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু ওয়াং গাড়ি থেকে নেমে সকলকে এমন বিনীতভাবে প্রচুর অভিবাদন করতে লাগলেন। যে, ভবঘুরেরা তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

বাবুরাম একটু দূর থেকে দৃশ্যটা দেখছিলেন। দেখতে-দেখতে হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা খবর চিড়িক দিয়ে গেল। এ-লোকটা ডক্টর ওয়াং না? চিনের বিশ্ববিখ্যাত দেশত্যাগী বৈজ্ঞানিক! বাঁ গালে লাল জড়লটা অবধি আছে। কিন্তু গতকালই তো এন বি সির খবরে বলেছে, ডক্টর ওয়াং লন্ডনে সেফ কাস্টডি থেকে পালিয়ে গেছেন। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না গত বুধবার থেকে।

বাবুরাম এগিয়ে এসে ওয়াং-এর সামনে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "আমার যদি খুব ভুল না হয়ে থাকে তা হলে আপনি ডক্টর ওয়াং।"

ওয়াং আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "দেখা যাচ্ছে আমি সত্যিই বিশ্ববিখ্যাত। বাবুরাম গাঙ্গুলি, আপনিও কম বিশ্ববিখ্যাত নন। আমি টিভিতে আপনার ছবি দেখেছি। আপনার স্ত্রী এবং ছেলেকেও সবাই চিনে ফেলেছে।"

“ডক্টর ওয়াং, আপনি তো আমেরিকাতেই এলেন, তবে লন্ডনের সেফ হাউস থেকে পালালেন কেন?”

ওয়াং ব্যথিত গলায় বললেন, “না পালালে ওরা কী করত জানেন? আমাকে ভি আই পি সাজিয়ে এখানে এনে একরকম নজরবন্দী করে নানারকম জেরায় পেটের কথা বের করত। দেশত্যাগীদের কি ঝামেলার অন্ত আছে? তাতে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট হত, কাজের কাজ হত না। তাই পালিয়ে বন্ধুদের সাহায্যে ছদ্মবেশে ভূয়া পাসপোর্ট দেখিয়ে চলে এসেছি।”

বাবুরাম মাথা নেড়ে বললেন, “বুঝেছি, আপনি দুঃসাহসী মানুষ। দেশ ছেড়ে পালালেন কেন ডক্টর ওয়াং?”

“প্রতিভাবানদের কোনও দেশ নেই গাঙ্গুলি। পুরো পৃথিবীটাই তাদের কাজের জায়গা। একটা দেশে আটকে থাকলে তাদের চলে না। আমাকে আপনি বিশ্বনাগরিক বলে ভাবতে পারেন।”

বাবুরাম এই দুঃখেও ওয়াং-এর কথায় হাসলেন। বললেন, “আপনার কী একটা আবিষ্কার চুরি গেছে বলে শুনেছি।”

ডক্টর একথায় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ছলছল করতে লাগল। রুমাল বের করে তিনি চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, “ওকথা মনে করিয়ে দেবেন না বাবুরাম গাঙ্গুলি। সে ছিল আমার বুকের হাড়, চোখের মণির চেয়েও মূল্যবান। ওরকম বায়োমেকানিক রোবট কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি আজও। তার ভিতরে আমি এক অনন্ত শক্তির উৎস সৃষ্টি করেছিলাম। শুধু সেটার একটাই দোষ ছিল, সে নিজে থেকে কিছু করতে পারত না। তবে কাছাকাছি মানুষের ইচ্ছে বা চাহিদা অনুসারে সে অনেক অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। তার নাম দিয়েছিলাম চি চেং। আমার ছেলে থাকলে সেও আমার এত প্রিয়পাত্র হত না, যতটা ছিল চি চেং।”

ওয়াং খানিকটা সামলে ওঠার পর বললেন, "গাঙ্গুলি, আপনার ছেলের বিষয়ে আমি শুনেছি। আমি কি তাকে একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আসুন ডক্টর ওয়াং।"

বাবুরাম গুদামের ভিতরে, যেখানে বনিকে কোলে নিয়ে প্রতিভা বসে ছিলেন, সেখানে নিয়ে গেলেন। প্রতিভা প্রথমে ওয়াংকে দেখে অস্বস্তি বোধ করলেও বাবুরামের ইশারায় বনিকে ওয়াং-এর হাতে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বনির চোখ দুখানা প্রথমে নীল তারপর সবুজ হয়ে গেল।

ওয়াং কিছুক্ষণ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এই রংগুলোর অর্থ আছে। ও আমাকে দেখে খুশি হয়েছে।"

বাবুরাম মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "বনির অসুখটা কী ডক্টর ওয়াং?"

ওয়াং বনিকে শুইয়ে দিয়ে তার সঙ্গীকে ডেকে একটা হুকুম দিলেন। তার সঙ্গী দৌড়ে গিয়ে একটা কালো বাক্স নিয়ে এল। ওয়াং সেই বাক্সটার ডালা খুলতে দেখা গেল ভিতরে নানা জটিল ও সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি রয়েছে। এত জটিল যে, বাবুরাম অবধি যন্ত্রটার প্রকৃতি বুঝতে পারলেন না।

ওয়াং বললেন, "এটা অত্যাধুনিক একটা স্ক্যানার। কোনও ভয় নেই, এই যন্ত্র আপনার ছেলের কোনও ক্ষতি করবে না।"

আধ ঘণ্টা ধরে ওয়াং বনির শরীরের সর্বত্র একটা স্টেথসকোপ জাতীয় জিনিস লাগিয়ে পরীক্ষা করলেন। তার ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখে চিন্তার বলিরেখা। তারপর যন্ত্র গুটিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "ব্যর্থতা! আবার একটা ব্যর্থতা! লোকগুলো অপদার্থ।"

বাবুরাম উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ডক্টর ওয়াং?"

“আপনার ছেলের এমব্রায়োতে একটি বায়োনিক মাইক্রোচিপ কেউ সেট করে দিয়েছিল। জিনিসটা এত ছোট যে আপনার সে সম্পর্কে ধারণাই হবে না। চিপটা ঠিকমতো সেট হয়ে গেলে আপনার ছেলে হয়ে উঠত আধা-যন্ত্র, আধা-মানুষ। কিন্তু গবেষণাটি এখন পরীক্ষামূলক স্তরে আছে বলেই আমার ধারণা, যারা এটা করছে তারা খবর রাখছে, কোন মা কখন সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। তাদের অজান্তেই গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে ওই মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই মাইক্রোচিপের ধর্মই হল তা ভূণের শরীরে ঢুকেই শিরা-উপশিরা দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয়। সেই ভুণ যখন। সন্তান হয়ে জন্মাবে তখন হবে অত্যধিক মেধাবী, অত্যধিক কর্মপটু, কিন্তু তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে অন্য লোক। এইসব সন্তান মাঝে-মাঝে রিমোট কন্ট্রোলে প্রত্যাদেশ পাবে। এবং সেই আদেশ এরা অক্ষরে-অক্ষরে মানতে বাধ্য। এদের দিয়ে যা খুশি করানো যাবে। মিস্টার বাবুরাম গাঙ্গুলি, আমি দুঃখিত, আপনিও এইসব শয়তনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। তবে বনির ক্ষেত্রে মাইক্রোচিপটা কোনও কারণে ঠিকমতো কাজ করছে না। কোনও একটা বায়ো মেকানিকাল গোলমাল ওর মস্তিষ্ক আর শরীরের মধ্যে একটা পরদা পড়ে গেছে। ওর মাথা ক্রিয়াশীল, কিন্তু শরীর নয়।”

বাবুরাম স্তম্ভিত হয়ে বললেন, “সর্বনাশ!”

“এব্যাপারে একসময়ে আমিও কিছুদূর গবেষণা করেছি। তাই আমি ব্যাপারটা এত চট করে ধরে ফেলতে পারলাম। তবে মিস্টার গাঙ্গুলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বনির মধ্যে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া ওরা ওদের রিমোট সেনসরে ধরতে পেরেছে যাতে ওরাও উদ্বিগ্ন। ওরা হয়তো বনিকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করবে। আপনার এখন ওকে। নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উচিত।”

“আমরা পালাতেই চাইছি ডক্টর ওয়াং।”

“সেটা সহজ হবে না। আপনার বাড়িতে আজ তিনজন অতিকায় গুণ্ডাকে ঘায়েল করে মাইককে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে হয়েছে।”

"সর্বনাশ!"

"তাই বলছি, ওরা আপনার পালানোর পথ বন্ধ করার সবরকম চেষ্টা করবে।"

উদ্বেগে আতঙ্কে অস্থির হয়ে বাবুরাম বললেন, "তা হলে কী করব ওয়াং?"

তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আপনাকে পালাতেই হবে। নইলে ওরা বনিকে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ওর মাথা চিরে দেখবে কেন ওদের প্ল্যানমতো কাজ হয়নি। ওরা হয়তো আরও অনেক শিশুকেই এরকম গবেষণার বস্তু করেছে। জানি না সেসব শিশুর ভাগ্যে কী ঘটছে। ওরা বর্বর! ওরা মানুষের চরম শত্রু!"

বাবুরাম স্ত্রীর দিকে তাকালেন। প্রতিভা মৃদুস্বরে বললেন, "ভয় পেও না। ঠাকুরের ওপর ভরসা রাখো। আমরা ঠিক পালাতে পারব। বিপদে মাথা ঠিক রাখতে হয়।"

বাবুরাম স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় একটু শান্ত হলেন।

ওয়াং বললেন, "শুনেছি আপনি ভবঘুরের ছদ্মবেশে পালাতে চান। ভাল পরিকল্পনা। তবে এয়ারপোর্টে তো আর ছদ্মবেশ চলবে না। পাশপোর্ট দেখানোর সময় ছদ্মবেশ খুলতেই হবে। তখন বিপদ। বাবুরাম গাঙ্গুলি, বিজ্ঞানের স্বার্থে আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

"করবেন! বাঁচলাম।"

"এখন আমি যাচ্ছি। যথাসময়ে আমার দেখা পাবেন।"

"শুনুন ওয়াং। ডাক্তার লিভিংস্টোনের ক্লিনিক সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?"

"ক্লিনিকটা পোর্টল্যান্ডে?"

ওয়াং-এর খুদে-খুদে চোখ যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হল, "পোর্টল্যান্ডের ডক্টর লিভিংস্টোন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি চেনেন?"

ওয়াং বড় বড় কয়েকটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ঠিক আছে। ও কথা পরে হবে আপনি আর দেরি করবেন না।"

বাবুরামের মনে হল, ডক্টর লিভিংস্টোন সম্পর্কে কী-একটা কথা চেপে গেলেন ওয়াং। একটু দ্রুত পদেই যেন ওয়াং বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা বেশ দ্রুত বেরিয়ে গেল।

বাবুরাম আর প্রতিভা কিছুই খেতে পারলেন না। তাদের অনেক সাধাসাধি করে বডি হার মানল। তবে বনির খাবার যথেষ্টই সঙ্গে ছিল। তাকে প্রতিভা খাওয়ালেন। বিকেল হয়ে আসতেই বাবুরাম আর প্রতিভা তাঁদের ছদ্মবেশ পরে নিলেন। বনির মাথাতেও একটা পরচুলা পরিয়ে নেওয়া হল আর গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হল শরীর ট্যান করার রং। বুড়িটা দু'জোড়া রোদ-চশমাও এনে দিল। এসব জিনিস ওরা কুড়িয়েও পায়, চুরিও করে।

ফ্রেড কোথাও গিয়েছিল। দুপুরেই ফিরে এসেছে। সে বলল, "এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছনোর কোনও চিন্তা নেই। আমি একটা ডাম্প ইয়ার্ড থেকে পুরনো ফোর্ড গাড়ি জোগাড় করেছি। সেটা বেশ চলে। তবে পুলিশে ধরলে বিপদ আছে। আমাদের লাইসেন্স নেই।"

বাবুরাম বললেন, "সাবধানে চালালে পুলিশ ধরবে না। ঠিক আছে, আমিই চালাব।"

সন্ধের কিছু আগে ফ্রেড আর মাইককে নিয়ে বাবুরাম সপরিবারে এয়ারপোর্টে রওনা হলেন। মুশকিল হল, তাঁরা নিজেদের নামেই প্লেনে টিকিট বুক করতে বাধ্য হয়েছেন। শত্রুপক্ষ খবর পেলে বিপদ আছে কপালে।

নিউ জার্সি পেরিয়ে গাড়ি ব্রুকলিন ব্রিজে উঠল, তারপর নিউ ইয়র্ক শহরকে পাশে ফেলে চলল সোজা জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে। অনেকটা রাস্তা। কিন্তু রাস্তায় আর কিছু ঘটল না। গাড়িটা একটু-আধটু আওয়াজ করলেও শেষ অবধি বিশেষ গণ্ডগোল করল না!

টার্মিনালের সামনে তাঁদের নামিয়ে দিয়ে মাইক আর ফ্রেড গেল গাড়িটা পার্ক করে আসতে। পার্ক করা বেশ ঝামেলার ব্যাপার।

দু’ জন ভবঘুরের ছদ্মবেশে টার্মিনালে ঢুকতে যেতেই লোজন বেশ তাকাতে লাগল তাদের দিকে। তবে দেশটা আমেরিকা। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা খুব বেশি বলে কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।

টার্মিনালে ঢুকে রেস্টরুম-এ গিয়ে দু’জনেই পর্যায়ক্রমে ছদ্মবেশ ছেড়ে এলেন।

বাবুরাম উদ্বেগের গলায় বললেন, “চারদিকে চোখ রেখো প্রতিভা।”

প্রতিভা ছেলেকে আঁকড়ে ধরে আছেন। শান্ত গলায় বললেন, “কিছু হবে না। শান্ত হও। আমি চোখ রেখেছি।”

বাবুরাম চঞ্চল চোখে চারদিকে চাইতে লাগলেন। অনেক যাত্রীর ভিড়ে কাকে তিনি শত্রুপক্ষের লোক বলে চিহ্নিত করবেন? সামনের লাইনটাও বেশ লম্বা। একজন দীর্ঘকায় তোক এসে বাবুরামের পিছনে দাঁড়াল। শ্বেতাঙ্গ। মখচোখ যেন কেমন পাথরে। বাবুরাম একবার তাকিয়েই ভয়ে ভয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। চোরা চোখে লক্ষ করলেন লোকটা তার কোটের পকেটে হাত ভরে আছে।

লোকটা হঠাৎ খুব চাপাস্বরে বলল, “একটা পিস্তলের নল তোমার শরীরের দিকে তাক করা আছে। তোমার স্ত্রীকে বলো কোনওরকম চেঁচামেচি বা গণ্ডগোল না করে ধীরে-ধীরে

টার্মিনালের বাইরে যেতে। তুমিও তাই করবে। বাইরে গাড়ি এসে তোমাদের তুলে নেবে।”

বাবুরাম ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন ভয়ে। একেবারে কাঠ।

লোকটা পিঠে বাস্তবিকই একটা কঠিন জিনিসের খোঁচা দিয়ে বলল, “পনেরো সেকেণ্ডের বেশি সময় দেব না। চারদিকে আমাদের লোক আছে মনে রেখো।

বাবুরাম সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রতিভার কানে কানে বললেন, “আমার পিঠে পিস্তলের নল। বাইরে যেতে বলছে। কী করব প্রতিভা?”

প্রতিভা শান্ত গলায় বললেন, “এ যা বলছে তাই করতে হবে। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখো আর আমার পিছনেই থেকো।”

প্রতিভা বনিকে কোলে নিয়ে ধীর পায়ে লাইন থেকে বেরিয়ে এলেন, “তারপর দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। পিছনে বাবুরাম। তার পিছনে সেই লোকটি।”

দরজার কাছ বরাবর যেতেই ব্যস্তসমস্ত এক যাত্রী মালের ট্রলি নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকলেন। ট্রলিতে বেশ বড় বড় দুটো স্যুটকেস, ব্যাগ, ছাতা ইত্যাদি। লোকটি ট্রলিটা নিয়ে হুড়মড় করে ঢুকেই সোজা যেন বাবুরামের ঘাড়েই এসে পড়ছিলেন। বাবুরাম সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু লোকটা প্রায় উন্মাদের মতো ট্রলিটার একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে কনুইয়ের তোয় বাবুরামকে ছিটকে দিলেন।

একটা “ওঃ গড!” চিৎকার শোনা গেল। বাবুরাম সামলে উঠে পিছন ফিরে দেখলেন তাঁর অনুসরণকারী লম্বা লোকটা হাঁটু চেপে ধরে মেঝের ওপর বসে আছে। চোখে-মুখে বোকার মতো ভাব। যাত্রীটি নিচু হয়ে বারবার ক্ষমা চাইছে লোকটার কাছে, বড় তাড়াহুড়োয় তোমাকে জখম করে ফেলেছি। কিছু মনে কোরো না...

বলতে বলতে যাত্রীটি লোকটার বগলের তলায় হাত দিয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু বাবুরাম স্পষ্ট দেখলেন যাত্রীটির হাতে একটি চাকতির মতো কী জিনিস যেন। আহত লোকটা একবার উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে গেল।

এই গণ্ডগোলে হঠাৎ বাবুরাম দেখতে পেলেন, চার-পাঁচটা লোক এসে জলদিবাজ যাত্রীটিকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের চেহারা বা হাবভাব সুবিধের নয়। যাত্রীটি হাত-পা নেড়ে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে তাদের। লোকটা ওয়াং নন। তবে তাঁর শাকরেদ হতে পারে।

বাবুরাম প্রতিভার দিকে চেয়ে বললেন, "ফিরে এসো। বোধ হয় এ যাত্রা বেঁচে যাব।"

"ও লোকটা কে?"

"চিনি না।"

"ইচ্ছে করে এরকম করল নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

" তা হলে কিন্তু তোমার উচিত ওকেও সাহায্য করা। ওই দ্যাখো, কতগুলো লোক ওকে কেমন ঘিরে ধরেছে।"

বাবুরামের মনে হল, প্রতিভা ঠিকই বলেছে। লোকটা যদি তাঁদের বাঁচানোর জন্যই ওই কাণ্ড করে থাকে তাহলে বাবুরামেরও উচিত। লোকটার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

বাবুরাম কখনও মারপিট করেননি। বরাবর ভাল ছেলে ছিলেন। তবে খেলাধুলা করতেন। এখনও জগিং করেন, দু-চারটে আসনও। গায়ে তাঁর জোর আছে কি না তা তিনি জানেন না। এ সুযোগে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

তিনি এগিয়ে যেতে যেতেই দেখলেন, দানবাকৃতি পাঁচটা লোক প্রায় ঠেসে ধরে যাত্রীটিকে পায়ে পায়ে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বাবুরাম চিন্তাভাবনা না করেই সামনে যে পড়ল সোজা তার মাজায় নিজের বুটসুষ্ঠু পা সজোরে বসিয়ে দিলেন।

বলতেই হবে মারটা বেশ জোরালোই হল। লোকটা লাথির চোটে ছিটকে পড়ে গেল। আর বাকি চারটে লোক এত অবাক হয়ে বাবুরামের দিকে তাকাল যে, বলার নয়।

ভূপাতিত লোকটার বিশেষ লাগেনি। মারটার খেয়ে এরা বেশ তৈরি হয়ে গেছে। লোকটা এক লাফে উঠে এসে বাবুরামের মুখে একটা ঘুসি চালিয়ে দিল। বাবুরাম খানিকটা শূন্যে উঠে চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে দড়াম করে আছড়ে পড়লেন। লোকটা বাবুরামকে লাথি মারতে পা তুলেছিল, এমন সময় মশার কামড়ের মতো কিছু বিধল বোধ হয় তার ঘাড়ে। কেমন যেন বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তারপর ধীরে-ধীরে ভেঙে পড়ে গেল।

অন্য চারজন ধৃত লোকটিকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তাড়াতাড়ি এসে প্রতিভাকে পাকড়াও করল টেনে নিয়ে যেতে লাগল দরজার দিকে।

কিন্তু এ-সময়ে দরজাটা জ্যাম করে দু-দুটো মালের ট্রলি এসে এমন আটকে গেল যে, কিছুতেই ছাড়ানো যায় না দুটোকে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

দু'জন চিনা যাত্রী এই কাণ্ডের জন্য সকলের কাছে প্রচুর ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কিন্তু তাতে পথ পরিষ্কার হল না। চারটে গুণ্ডা খেপে গিয়ে দমাদম ট্রলি থেকে মালপত্র তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। তাদের ধাক্কায় যাত্রীরাও ছিটকে যাচ্ছে এদিক-ওদিক ছুটে এল সিকিউরিটির লোকেরা। আর এই গণ্ডগোলে লাল জড়লওলা বেঁটেমতো একটা লোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে শান্তমুখে একটু হাসল।

আগন্তুক চিনা, যাত্রী দুজনের মাল গুণ্ডারা ফেলে দেওয়ায় খেপে গিয়ে লাফ দিয়ে তারা ট্রলি ডিঙিয়ে এসে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করল গুণ্ডাদের। হাত লাগাল আগের যাত্রীটিও।

এই ফাঁকে বনিকে নিয়ে সরে এসে স্বামীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন প্রতিভা। তাঁর পাশে সেই বেঁটে চিনা ভ ভদ্রলোকও।

মৃদুস্বরে ওয়াং বললেন, "দ্যাট ওয়াজ এ ন্যাস্টি নক আউট পানচ। তোমার স্বামী কখনও বকসিং করেছে?

"না। জীবনে নয়।"

ওয়াং পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে এনে তা থেকে কয়েকটা লম্বা ছুঁচ তুলে নিলেন, বললেন, "আকুপাংচার, খুব কাজ হয়। ওর মুখে চোখে একটু জল দাও।"

বনির বোতলে জল ছিল। প্রতিভা সেই জল ঢেলে হাতের কোষে নিয়ে মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিলেন বাবুরামের। আর দক্ষ হাতে বাবুরামের ঘাড়ে এবং আশপাশে উঁচগুলো বিধিয়ে দিলেন ওয়াং।

তিন চিনা কী কায়দা কবল কে জানে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার-চারটে গুণ্ডার দুজন ধরাশায়ী হয়ে প্রাণ হারাল। দু'জন পালাল।

ওয়াং মৃদুস্বরে বললেন, "এরা সব আমার চ্যালা। জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি আমি। আমেরিকান গুণ্ডারা ঘুসি আর ছোরাঘুরি আর পিস্তল ছাড়া কিছুই জানে না। বড় ক্রুড। বিজ্ঞানের যুগে কতরকম উপকরণ বেরিয়ে গেছে, এরা সেসব গ্রাহ্যই করে না। দেখলে তো, তিনটে রোগাপটকা চিনার কাছে কেমন নাকাল হল চার-চারটে দশাসই আমেরিকান!"

এত দুঃখেও একটু হাসলেন প্রতিভা। বললেন, "আপনি না থাকলে কী যে হত!"

বাবুরাম চোখ মেললেন, কাতর শব্দ করলেন, তারপর উঠে বসে বললেন, "আমার চোয়াল বোধহয় ভেঙে গেছে।"

ওয়াং মৃদু হেসে বলেন, "না মিস্টার গাঙ্গুলি। আপনার শরীরে ষাঁড়ের মতো ক্ষমতা আছে। যাকগে, লড়াই শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে আর বিপদ ঘটবে না। পুলিশও এসে গেছে। আর দেরী না করে লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। ভাবখানা এমন করবেন যেন কিছুই হয়নি।"

বাবুরাম দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, "সবকিছুর জন্যই। আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা কৃতজ্ঞ।"

ওয়াং সংক্ষেপে যা বললেন, তার অর্থ, সব ভাল যার শেষ ভাল। বাবুরাম আর প্রতিভা লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতে পাশপোর্ট, টিকিট। হই-হট্টগোলে তাঁদের কেউ আলাদা করে লক্ষ করল না।

.

আতঙ্কিত, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত অবস্থায় বাবুরাম আর প্রতিভা যখন কলকাতায় পৌঁছলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। তবে কলকাতার মাটিতে পা রেখে তাঁরা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। হঠাৎ এসেছেন বলে

তাঁদের নিয়ে যেতে কেউ বিমানবন্দরে আসেনি।

মালপত্র বলতে তাঁদের সঙ্গে সামান্যই জিনিস। কাস্টমস পেরিয়ে তাঁরা একটা প্রি-পেইড ট্যাক্সি নিলেন। বাড়ির দরজায় যখন এসে নামলেন তখন ঘুটঘুট্টি লোডশেডিং-এর অন্ধকার চারদিকে।

বাড়ির লোক খেয়ে-দেয়ে ঘুমোনোর আয়োজন করছিল। তাঁদের আগমনে সারা বাড়ি আনন্দে বিস্ময়ে ফের জেগে উঠল। বাবুরামের বাবা বলাইবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনিও প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর নাতি এসেছে যে!

৫. সায়েন্স দিয়ে সবকিছুকে ব্যাখ্যা

সায়েন্স দিয়ে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না গদাইবাবু। দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে লোডশেডিং-এ তাঁর বাড়িতে আলো জ্বলে এবং তাঁর সাদা কালো টিভি-তে এন বি সি বা বি বি সি'র রঙিন সম্প্রচার দেখা যায়-এসবের জন্য তাঁর বাড়িতে আজকাল সন্ধেবেলায় বেশ ভিড় হচ্ছে। অনেকেই দেখতে আসছে কাণ্ডটা।

সি ই এস সি'র লোকেরাও এসে তাঁর বাড়ির লাইন পরীক্ষা করে বলেছে, না কোনও হট লাইনের সঙ্গে তাঁর বাড়ির তার জড়িয়ে যায়নি। তবু কেন কারেন্ট না থাকলেও আলো জ্বলে তা তারা বুঝতে পারছে না।

গদাইবাবুর সম্বন্ধি গজেন এক দিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "শোনো গদাই, আমাদের পাশের বাড়িতে একজন মস্ত ইলেকট্রনিক্সের এঞ্জিনিয়ার এসেছে। দেড় গজ লম্বা তার টাইটেল। আমেরিকায় একটা বড় ফার্মের চিফ ইলেকট্রনিক্স এঞ্জিনিয়ার। বছরে দেড় লাখ ডলার মাইনে। তাকে কালই ধরে এনে তোমার বাড়ির লাইন দেখাব। সন্ধের পর থেকে। সে আসতে রাজি হয়েছে।"

গদাইবাবু উদাস গলায় বললেন, "যা ভাল হয় করুন।"

পরদিন সন্ধেবেলা যাকে নিয়ে এল গজেন তাকে দেখে গদাইবাবুর বড় চেনা-চেনা ঠেকতে লাগল। এ-মুখ যেন দেখেছেন কোথাও। নামটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন গদাইবাবু, "আপনিই বাবুরাম গাঙ্গুলি? বনির বাবা! আপনাকে এন বি সি'র নিউজ চ্যানেলে দেখেছি।"

বাবুরাম অবাক হয়ে বললেন, "এন বি সি! আপনি কি রিসেন্টলি আমেরিকায় গিয়েছিলেন?"

"না। কস্মিনকালেও যাইনি।"

"তা হলে কি এন বি সি'র ভিডিও ক্যাসেট দেখেছেন?"

"না। আমার ভি সি আর নেই।"

"তা হলে?"

গদাইবাব আমতা-আমতা করে বললেন, "ওই আর কি। আসলে কী জানেন, আমার বাড়িতে অদ্ভুত সব কাণ্ড হচ্ছে। তার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। এন বি সি চ্যানেল আমি এই টিভিতেই দেখেছি।"

"কিন্তু এ তো অর্ডিনারি টিভি! কলকাতার প্রোগ্রামই তো দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু মাঝে-মাঝে..."

বলতে বলতেই গদাইবাবুর টিভি রঙিন হয়ে গেল। স্পষ্ট চলে এল এন বি সি'র প্রাতঃকালীন সংবাদ। বাবুরাম স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। এরকম হওয়ার কথা নয়। এ এক অসম্ভব কাণ্ড। মার্কিন টিভির প্রোগ্রাম কী করে কলকাতায় দেখা যাচ্ছে!

খবরে যে ঘটনাটি একটু বাদেই শুনলেন বাবুরাম তাতে আরও বিস্মিত এবং হিম হয়ে গেলেন। সংবাদ-পাঠক জানালেন, পোর্টল্যাণ্ডে একটি জঙ্গলের ধারে ডক্টর ওয়াং-কে সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। ওয়াং বিশ্ববিখ্যাত চিনা বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি তিনি দেশ থেকে পালিয়ে মার্কিন দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু লণ্ডন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপরই তাঁকে এই অবস্থায় পাওয়া যায়। কয়েকজন ভবঘুরে তাঁকে উদ্ধার করে নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওদিকে চিন সরকার জানিয়েছেন যে, ইনি আসল ডক্টর ওয়াং নন। ডক্টর ওয়াং-এর উদ্ধারকারীদের একজনের জবানিতে শুনন। ইনি ফ্রেড মেইলার.... বলতে-বলতেই ফ্রেড-এর চেহারা ভেসে উঠল পরদায়। সেই পোশাক, সেই টুপি। ফ্রেড থেমে-থেমে বলল, "ডক্টর ওয়াং অত্যন্ত ভাল লোক। তাঁকে আমরা

চিনতাম। পোর্টল্যাণ্ডে তিনি একটি বিশেষ অভিযানে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযান ছিল কিছু দুষ্ট লোকের বিরুদ্ধে। আমাদের বিশ্বাস, ডক্টর ওয়াং-কে ওই শয়তানেরা আবার মারবার চেষ্টা করবে।”... ফ্রেড-এর ছবি কেটে দিয়ে সংবাদ-পাঠক বললেন, “ডক্টর ওয়াং-এর জ্ঞান না থাকলেও তিনি মাঝে-মাঝে দু-চারটে শব্দ বারবার উচ্চারণ করছেন। তার মধ্যে একটা হল চি চেং। আর একটা বনি। বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে ডক্টর ওয়াং-এর বাঁচবার সম্ভাবনা সম্পর্কে ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারবেন না। দুটি গুলি তাঁর ঊরুতে লেগেছে, একটি ঘাড়ে। তাঁর গায়ে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট থাকায় হৃৎপিণ্ডে বা ফুসফুসে কোনও গুলি লাগেনি। তবে দুঃখের বিষয় ডক্টর ওয়াং-এর সঙ্গী দু’জন ভবঘুরে এবং একজন চিনা নিহত হয়েছেন।”

সংবাদ শেষ হয়ে গেল।

বাবুরাম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনটা ভরে গেল বিষণ্ণতায়। পোর্টল্যাণ্ডে কেন গিয়েছিলেন ওয়াং? তবে কি ডক্টর লিভিংস্টোনের ক্লিনিকেই আছে মানুষকে যান্ত্রিক দাস বানানোর কারখানা? ওয়াং কি ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিলেন? চি চেং এবং বনির নামই বা তিনি করছেন কেন বিকারের ঘোরে? এই দুইয়ের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে? চি চেং হল ওয়াং-এর সেই আবিষ্কার যা চুরি হয়ে গেছে। নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল বাবুরামের। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ওয়াং অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন।

গদাইবাবু শুকনো মুখে বললেন, “কিছু বুঝতে পারছেন বাবুরামবাবু?”

বাবুরান অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, “না। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। তবে আমি আগামীকাল আবার আসব। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে।”

.

পর দিন বাবুরাম সকালের ডাকে একটা চিঠি পেলেন। বারো দিন আগে নিউ ইয়র্ক থেকে পোস্ট করা ডক্টর ওয়াং-এর চিঠি। ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠিতে ওয়াং লিখেছেন, আপনি

এত দিনে নিরাপদে দেশে পৌঁছে গেছেন আশা করছি। দয়া করে বনির কোনও চিকিৎসা করাতে যাবেন না, তাতে ওর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যে দুষ্টচক্র বিশ্বব্যাপী নিজেদের যান্ত্রিক দাস তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে তাদের সম্পর্কে আরও কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। বনির মতো আরও কিছু শিশুকে মাতৃগর্ভেই এরা যান্ত্রিক আজ্ঞাবহ দাস বানানোর পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও শতকরা একশো ভাগ সফল নয়। কিন্তু আমার ভয়, এরা অচিরেই সফল হবে। তার ফলে কী হবে জানেন? হাজার হাজার মানুষকে এরা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালাবে, যা খুশি করিয়ে নেবে। হয়তো নরহত্যা, চোরাই চালান, হাইজ্যাকিং, টেররিজম। আর এইসব যান্ত্রিক দাসেরা হবে খুব বুদ্ধিমান, সাঙ্ঘাতিক মেধাবী, অসম্ভব ক্ষিপ্র ও শক্তিশালী। এদের কোনও নৈতিক বোধ বা চরিত্র থাকবে না, থাকবে না নিজস্ব কোনও চিন্তাধারা বা আদর্শ, থাকবে না স্নেহ ভালবাসা প্রেম বা দুর্বলতা। এসব ভেবে ভয়ে আমি শিউরে শিউরে উঠছি। ভাবছি যদি আজ আমার হাতের কাছে চি চেং থাকত, হয়তো সে আমাকে উপায় বাতলে দিতে পারত। চি চেং এক আশ্চর্য জিনিস। সে না করতে পারে হেন কাজ নেই। হায়, সে আজ কোথায়?....

চিঠিটা পড়তে-পড়তে বাবুরামের চোখ ঝাঁপসা হয়ে এল চোখের জলে।

একটু বেলায় বাবুরাম গদাইবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই বাড়ির রহস্যটাও তাঁকে ভীষণভাবে ভাবাচ্ছে। কোনও ব্যাখ্যাই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

গদাইবাবু আজ অফিস কামাই করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিগলিত মুখে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আসুন গাঙ্গুলি-সাহেব, আসুন। আপনিই এখন আমার শেষ ভরসা।"

বাবুরাম টিভি সেটটা খুলে তন্ন-তন্ন করে দেখলেন। অত্যন্ত সাধারণ সাদা কালো সেট। কোনও বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব নেই। সারা বাড়ি ঘুরে-ঘুরে দেখতে-দেখতে তাঁরা ছাদে এলেন।

গদাইবাবু একজন বিজ্ঞানীকে কাছে পেয়ে নিজের ল্যাবরেটরিটা দেখানোর লোভ সামলাতে পারলেন না। চিলেকোঠার দরজাটা খুলে দিয়ে সগর্বে বললেন, "বাবুরামবাবু, আমি বিজ্ঞানী নই বটে, কিন্তু খুব বিজ্ঞান-মাইণ্ডেড। এই দেখুন, আমিও একটু চচা-টচা করে থাকি।"

বাবুরাম গদাইবাবুর ল্যাবরেটরি দেখে হাসলেন। তবে ভদ্রতাবশে সব-কিছুই খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওটা কী বস্তু গদাইবাবু?"

গদাইবাবু বললেন, "ব্যাটারা ঠকিয়ে দিয়েছে মশাই। মিস্টিরিয়াস মিস্টার পানচো নামের একটা সায়েন্স কিট নিয়ে এলুম। তার কোনও মাথামুণ্ডুই বুঝলুম না। এখন পড়ে আছে।"

বাবুরাম তাক থেকে পানচোকে নামিয়ে এনে ভাল করে দেখলেন। তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল চিন্তায়। বললেন, "কোথায় পেলেন এটা?"

"আজ্ঞে চিনে-বাজারে।"

"জিনিসটা কোনও কাজেই লাগেনি?"

"না। আপনি নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন কোনও কাজ হয় কি।"

বাবুরাম পানচোকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন ফের। একটা ব্যারেল আর কয়েকটা ধাতব হাত বা স্ট্যাণ্ড। তবে স্ট্যাণ্ডগুলোর গড়ন দেখে মনে হচ্ছে, সেগুলির ভিতর সম্মু যন্ত্রপাতি থাকতে পারে। বাবুরাম ব্যারেলের গায়ে কান পাতলেন। অনেকক্ষণ কান পেতে তাঁর মনে হল, ব্যারেলের ভিতরে একটা অতি ক্ষীণ স্পন্দন বা ভাইব্রেশন হয়ে চলেছে।

বাবুরাম জিনিসটা খবরের কাগজ দিয়ে ভাল করে মুড়ে নিলেন।

বাড়ি ফিরে তিনি সোজা দোতলার একটা অব্যবহৃত ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিলেন। তারপর পানচোকে কাগজের মোড়ক থেকে বের করে উলটে-পালটে দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ আপন মনেই বাবুরাম ইংরেজিতে বলে উঠলেন, “টু নো দিস টয় আই নিড এ কমপিউটার।”

পানচোর ব্যারেলের মধ্যে একটা শিস টানার মতো শব্দ হল। বাবুরাম নীচে গিয়ে বাড়ির টিভি সেটটা নিয়ে এলেন। গদাইবাবুর বাড়িতে যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, সাধারণ টিভি সেটকে কমপিউটর ডিসপ্লে স্ক্রিনে পরিণত করা পানচোর পক্ষে কঠিন হবে না। তবে কোনও কি-বোর্ড নেই বা ডাটা ফিডমেন্টের উপায় দেখছেন না।

বাবুরাম কী করবেন ভাবছেন। এমন সময় আচমকা টিভির পরদায় অক্ষর ফুটে উঠতে লাগল। প্রথমেই ফুটে উঠল, “আই অ্যাম অলসো এ কমপিউটার।”

বাবুরাম বুঝলেন, ডাটা ফিডমেন্টের প্রয়োজন নেই, তাঁর কথা পানচো বুঝতে পারছে।

তিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, “তোমার নাম কী?”

“পানচো।”

“তুমি চি চেং-কে চেনো?”

“আমিই চি চেং।”

“তুমি ওয়াংকে চেনো?”

“ওয়াং আমার স্রষ্টা।” বাবুরামের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি হাসলেন। ঠাকুরের দয়ায় তিনি ওয়াং-এর সেই হারানো চি চেং-কে ফিরে পেলেন তা হলে! কী আশ্চর্য যোগাযোগ!

“গদাইবাবুর বাড়িতে যেসব অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছিল সেগুলো কে করত?”

“আমি করতাম।”

"কেন?"

"দুটো কারণে। ওসব করলে আমাকে নিয়ে হইচই হবে, পাবলিসিটি হবে এবং ডক্টর ওয়াং টের পাবেন আমি কোথায় আছি। দু' নম্বর কারণ, ডক্টর ওয়াং সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে যদি ওরা তাঁকে খবর দেয় সেই জন্য হংকং টিভির প্রোগ্রাম ট্যাপ করেছিলাম। কিন্তু ও লোকগুলো বোকা। বুঝতে পারেনি।"

"তুমি এন বি সি'র প্রোগ্রামও ট্যাপ করেছ। কেন?"

"এন বি সি'তে বনির ছবি দেখানো হয়েছিল।"

বাবুরাম চমকে উঠে বলল, "তুমি বনির কথা জানো?"

"জানি। ডক্টর ওয়াং বনি সম্পর্কে আমার ভিতরে কিছু ইনফরমেশন রেকর্ড করে রেখেছিলেন।"

"এইসব প্রোগ্রাম তুমি কী উপায়ে ট্যাপ করো?"

"খুব সোজা। আমি উপগ্রহ থেকে প্রোগ্রাম চুরি করি। আমার ভিতরে অনেক শক্তি, অফুরন্ত শক্তি।"

"তুমি বনি সম্পর্কে কী জানো?"

"তুমি যতটুকু জানো তার বেশি নয়।"

"আমি যা জানি তা তুমি কী করে জানতে পারছ?"

"আমি তোমার মগজ থেকে সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছি।"

"সর্বনাশ।"

“ভয়ের কিছু নেই। আমি ভালমানুষ।”

“ধন্যবাদ। বনি সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত কী?”

“ওর কোনও চিকিৎসা করা উচিত নয়।”

“ওকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব?”

“বনির মগজের মধ্যে একটা মাইক্রোচিপ রয়েছে। খুব ছোট।”

“ঠিক কোথায় মাইক্রোচিপটা রয়েছে?”

“মেডুলা ওবলংগাটায়। খুব সেনসিটিভ জায়গা।”

“অপারেশন করা কি সম্ভব?”

“না।”

“তা হলে?”

“বনিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।”

বাবুরাম বনিকে নিয়ে এলেন। বাড়ির সবাইকে বললেন, “তিনি একটা জরুরি কাজ করছেন, কেউ যেন বিরক্ত না করে।

বনিকে চি চেং-এর সামনে একটা টেবিলে শুইয়ে দিলেন বাবুরাম। বনির চোখের মণি অত্যন্ত দ্রুত রং পালটাতে লাগল। কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও সবুজ, কখনও গোলাপি।

চি চেং যেন দ্বিধায় পড়ে গেল। ডিসপ্লে স্ক্রিনে অনেকগুলো দুবোধ সংকেতবার্তা ফুটে উঠতে লাগল, যার অর্থ বাবুরাম জানেন না। তবে তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছিল, ডিসপ্লে

স্ক্রিনে দুটো বিরোধী কমপিউটারে একটা লড়াই ঘটে যাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টা এরকম চলল।

এর পর ডিসপ্লে বোর্ডে যে কথাটা ফুটে উঠল তা অবিশ্বাস্য। বাবুরাম সবিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে দেখলেন বোর্ডে একটা ছোট্ট বাক্য ফুটে উঠেছে, আমি বনি।

বাবুরাম বনির দিকে চেয়ে দেখলেন। বনি স্থির চোখে তাঁকে দেখছে। ঠোঁটে কি একটু হাসির ছোঁয়া?

বাবুরাম টিভি স্ক্রিনের দিকে চেয়ে দেখলেন, নতুন বাক্য এল, আমি চি চেং-কে দখল করেছি।

বাবুরাম অতি কষ্টে নিজেকে সামলালেন। মাত্র ছ'মাস বয়সের বনি কী করে এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে? গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বাবুরাম বললেন, "বনি, আমি তোমার বাবা।"

"না। আমার বাবা নেই, মা নেই।"

"তবে তুমি কে?"

"আমি শুধু বনি।"

"তোমার স্রষ্টা কে?"

"ডক্টর লিভিংস্টোন।"

"সে তোমার কাছে কী চায়?"

"সে আমাকে চায়।"

"তুমি কি তার কাছে যাবে?"

“যাব। ভীষণ দরকার।”

“কী দরকার?”

“তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।”

“লিভিংস্টোন কীরকম লোক?”

“ছ’ ফুট লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, বয়স পঞ্চান্ন, দুরন্ত মাথা।”

“তুমি কি জানো বনি, লিভিংস্টোন একটা দাস সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে?”

“হতে পারে। হয়তো তাই।”

“কীভাবে তোমার মাথায় মাইক্রোচিপ ঢোকানো হয়েছিল তুমি জানো?”

“জটিল পদ্ধতিতে। নাভির ভিতর দিয়ে সরু ক্যাথেডর ঢুকিয়ে। মাইক্রোসার্জারি। অন্তত দু’ দিন সময় লাগে।”

“বুঝেছি বনি। তোমার বয়স খুব কম, কিন্তু তবু তুমি চমৎকার বয়স্ক মানুষের মতো তথ্য দিচ্ছ, এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে?”

“আমার মগজের সব কোষ জাগ্রত।”

“তোমার শরীর অসাড় কেন?”

“চিপটা ঠিকমতো বসেনি।”

“আমরা চিপটা বের করতে চাই বনি। আমরা তোমাকে সন্তান হিসেবে ফিরে পেতে চাই।”

“সম্ভব নয়। মাইক্রোচিপটা আমার জৈবী সংস্থানের সঙ্গে মিশে গেছে।”

“যদি ওটা অকেজো করতে চাই তা হলে কী করতে হবে?”

“মাদার কমপিউটারকে ধ্বংস করা ছাড়া সম্ভব নয়। আমার মগজের মাইক্রোচিপ মাদার কমপিউটারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে টিউন করা।”

“সেটা কোথায় আছে?”

“ক্লিনিকে। বেসমেন্টে।”

“ক্লিনিক মানে কি লিভিংস্টোনের ক্লিনিক?”

“হ্যাঁ। পোর্টল্যাণ্ডে।”

“এ-ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই?”

“না।”

“মাইক্রোচিপটা যদি অকেজো করে দেওয়া যায় তা হলে কী হবে? তোমাকে কি আমরা ফিরে পাব বনি?”

“বলা কঠিন।”

“তুমি মরে যাবে না তো?”

“যেতে পারি।”

“তোমাকে আমরা ভীষণ ভালবাসি বনি। তুমি কি সেটা জানো?”

“ভালবাসা! হতে পারে।”

"তোমাকে বাঁচতেই হবে বনি। তুমি ভাল করে ভেবে দ্যাখো, মাদার কমপিউটারকে ধ্বংস করলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে কি না।"

"আমি ঠিক জানি না। তবে কাজটা বিপজ্জনক।"

"কমপিউটারে কতজন শিশুকে টিউন করা হয়েছে?"

"বত্রিশজন। তিন শো তেত্রিশজন এখনও মাতৃগর্ভে আছে।"

"তুমি এ-তথ্য কী করে জানলে?"

"প্রথম লটের সব মাইক্রোচিপই একরকম। আমি সংখ্যাটা জানি।"

"আমি তোমার সাহায্য চাই বনি। মাদার কমপিউটার ধ্বংস করতে হলে কী করতে হবে, তা আমি জানি না।"

স্ক্রিনটা হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে একটা বাক্য ফুটে উঠল, "খুব সাবধান।"

.

চি চেং ওরফে পানচোকে গদাইবাবুর হাতে ফেরত দেওয়া উচিত হবে কি না তা বাবুরাম বুঝতে পারছিলেন না। তবে সন্ধের দিকে তিনি গদাইবাবুর বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঘোর লোডশেডিং এবং গদাইবাবুর বাড়িও অন্ধকার।

তাঁকে দেখে গদাইবাবু আহ্লাদে একেবারে বিগলিত হয়ে বললেন, "ধন্য মশাই আপনি। কী একটু কলকাঠি নেড়ে গেলেন আর অমনি আমার বাড়িতে আবার আগের পরিস্থিতি ফিরে এসেছে।"

"আপনি কি তাতে খুশি?"

"খুব খুশি মশাই, খুব খুশি। যা ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়েছিল তাতে তো আমার হাত-পা সব পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাওয়ার জোগাড়।"

"পানচোকে কি আপনি ফেরত চান গদাইবাবু?"

"দূর দূর। টাকাটাই গচ্চা গেছে। ও আর চাই না। জঙ্গল দূর হওয়াই ভাল।"

৬. চার দিন বাদে মুখে দুশ্চিন্তা

চার দিন বাদে মুখে দুশ্চিন্তা এবং শরীরে ক্লান্তি নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেট থেকে এক বিকেলে নিউ ইয়র্কের জে এফ কে বিমানবন্দরে নামলেন বাবুরাম এবং বনিকে কোলে নিয়ে প্রতিভা।

প্রতিভাকে রেখে-ঢেকে সবই প্রায় বলেছেন বাবুরাম। শুধু বনির প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বনির জবানিতে যা জেনেছেন সেটা চাপিয়েছেন চি চেং তথা পানচোর ঘাড়ে। প্রতিভা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি। তবে বনির ভালর জন্য সবকিছু করতেই তিনি রাজি। তাই তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক আমেরিকাতেও ফিরে আসতে সম্মত হয়েছেন।

চি চেং-কে সঙ্গেই এনেছেন বাবুরাম। মস্ত বড় সুটকেসে জামা কাপড়ের সঙ্গেই তাকে ভরে লাগেজে দিয়েছিলেন। মালপত্র যখন এক্স-রে করা হচ্ছিল তখন বাবুরামের ভয় ছিল, পানচো ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, পানচোর ছবি এক্স-রে মেশিনে ধরা পড়েনি।

প্রতিভা বললেন, "শোনো, নিজেদের বাড়ি থাকতে হোটেলে ওঠাটা আমার পছন্দ নয়।"

বাবুরাম সবিস্ময়ে বললেন, "নিজেদের বাড়িতে উঠব! সর্বনাশ। শয়তানরা যে ওত পেতে থাকবে সেখানে!"

প্রতিভা শান্ত গলায় বললেন, "আমার তো ভয় করছে না। আমাদের সঙ্গে পানচো আছে।"

"পানচো!" বলে বাবুরাম একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। চলো, বাড়িতেই যাই। বাড়ি যেতে ইচ্ছেও করছে আমার।"

ট্যাক্সি নিয়ে তাঁরা জার্সি সিটির বাড়িতে এলেন। তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাজার করা, রান্না খাওয়া ইত্যাদিতে সময় চলে গেল। রাত্রিবেলা পানচোকে বেসমেন্টে নিয়ে গেলেন বাবুরাম। সঙ্গে বনি এবং প্রতিভাও বেসমেন্টে বাবুরামের নিজস্ব অত্যাধুনিক ব্যক্তিগত

কমপিউটার আছে। কমপিউটারের মাধ্যমে বনির সঙ্গে বাবুরামের কথা হতে লাগল।

"বনি, আমরা ফের আমেরিকায় এসেছি।"

"বুঝতে পারছি।"

"তোমার কেমন লাগছে?"

"ভাল।"

"বনি, মাদার কমপিউটারকে টের পাচ্ছ?"

"পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন, মাদার কমপিউটার আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবেই।"

"তুমি কি মাদার কমপিউটারকে পছন্দ করো?"

"কিছুটা করি। কিন্তু মাঝে-মাঝে..."

"মাঝে-মাঝে কী বনি?"

"মাঝে-মাঝে কী একটা গণ্ডগোল হয়ে যায়।"

"যদি মাদার-কমপিউটার ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে কি তুমি দুঃখ পাবে?"

"দুঃখ! না, ওসব আমার হয় না। তবে হয়তো আমিও ধ্বংস হয়ে যাব।"

"না, বনি, তুমি ধ্বংস হলে আমি কিছু করব না। একটা কথা বলব তোমাকে?"

"বলো।"

"মাদার কমপিউটারের চেহারাটা দেখতে চাই।"

"সঙ্গে-সঙ্গে পরদায় গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর মতো চেহারার একটা রেখাচিত্র ফুটে উঠল। তারপর দেখা গেল পরিষ্কার একটা রঙিন ফোটো।"

"বাবুরাম কমপিউটারের একজন বিশেষজ্ঞ। অনেকক্ষণ ধরে তিনি ছবিটা দেখলেন। তারপর বললেন, "বনি, আমি এর ট্রাইডেম চেহারা দেখতে চাই। পারবে দেখাতে?"

সঙ্গে-সঙ্গে ছবি ঘুরে চতুর্দিক থেকে কমপিউটারকে দেখাতে লাগল।

"তুমি এর ভিতরকার সার্কিটগুলোর প্ল্যান জানো?"

"সঙ্গে-সঙ্গে কমপিউটারের অভ্যন্তরে জটিল সব যন্ত্রপাতি ফুটে উঠল পরদায়। ডক্টর লিভিংস্টোন নিশ্চয়ই এত বোকা নন যে, তাঁর এই মূল্যবান কমপিউটারের সব তথ্য তাঁর দাসদের জানিয়ে রাখবেন। এটা যে সম্ভব হচ্ছে পানচো তথা চি চেং-এর জন্যই তা বুঝতে বাবুরামের লহমাও লাগল না।

"বনি, আমি কমপিউটারটার সব রকম প্রিন্ট-আউট চাই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্লট দিয়ে অন্তত পনেরোখানা প্রিন্ট-আউট বেরিয়ে এল।

বাবুরাম সারা রাত জেগে সেগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

সকালবেলায় তিনি হাসপাতালে টেলিফোন করে ডক্টর ওয়াং-এর অবস্থা জানতে চাইলেন।

হাসপাতাল বলল, অবস্থা ভাল নয়। তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে।

বাবুরাম ফোন রেখে দিলেন। তারপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কী করবেন, কোন প্ল্যানমাফিক এগোবেন তা বুঝতে পারছেন না।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে তিনি গাড়ি নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন ভবঘুরেদের আস্তানায়। তাঁকে দেখে সবাই বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরল। বাবুরাম তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন, ওদের দুজন ওয়াংকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হওয়ায় ওরা ভীষণ ক্ষুব্ধ। তবে রাগটা ওয়াং-এর ওপর নয়, খুনেদের ওপর।

ফ্রেড বলল, "আমাদের কাছে অস্ত্র নেই। থাকলে এত দিনে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতাম।"

বাবুরাম ওদের শান্ত হতে খানিকটা সময় দিলেন। তারপর সকালের কথা থেকে যা বুঝতে পারলেন তা হল, তিনি আর প্রতিভা বনিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই ওয়াং এদের কাছে আসেন এবং আমেরিকায় নতুন ধরনের যান্ত্রিক দাস তৈরি করার ষড়যন্ত্রটি ওদের বুঝিয়ে বলেন। পোর্টল্যাণ্ডের ডক্টর লিভিংস্টোনের ক্লিনিকটিই যে এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল তাও জানান। পুলিশ বা সরকার যে আইনের পথে এদের কিছু করতে পারবে না তাতেও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বুদ্ধিমান ওয়াং যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন সেটিই ছিল বোকার মতো। তিনি তাঁর তিনজন সঙ্গী এবং ভবঘুরেদের জনা-পাঁচেককে নিয়ে একটা দল গড়েন এবং সেই দল নিয়ে পোর্টল্যান্ডে গিয়ে লিভিংস্টোনের ক্লিনিকটি ঝটিতি দখল করার চেষ্টা করেন। উত্তেজনার মাথায় এ-কাজ করতে গিয়ে তাঁরা সহস্র প্রহরীদের পাল্লায় পড়ে যান। কয়েকজন পালাতে পারলেও যা। ঘটবার তা ঘটে গেছে।

"ফ্রেড, মাইক, তোমরা এখন কী করতে চাও?" বাবুরাম জিজ্ঞেস করলেন।

"কী করব তা বুঝতে পারছি না। লিভিংস্টোন পুলিশের কাছে নালিশ করেছে। পুলিশ তো আর জানে না যে, লিভিংস্টোন কী কাণ্ড করছে। প্রমাণ করাও সহজ নয়। ফলে পুলিশ তাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও ওই ক্লিনিকে আর হামলা করা সম্ভব নয়। লিভিংস্টোন ধূর্ত লোক।"

বাবুরাম বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছেন

দুপুরবেলা আবার কমপিউটারের প্রিন্ট আউট নিয়ে বসলেন। কিন্তু কোনও উপায় তাঁর মাথায় এল না।

প্রতিভা বললেন, “অত ভেবো না। খেয়ে নাও। তারপর বিশ্রাম করো। মাথা ঠাণ্ডা না হলে বুদ্ধি খেলবে কী করে?”

ভরদুপুরে যখন পাড়া সুনসান তখন হঠাৎ ডোরবেল শুনে প্রতিভা উঠলেন। জেট ল্যাগ-এর ক্লান্তি ছিল। সতর্ক হওয়ার কথা খেয়াল

করেই গিয়ে দরজাটা খুললেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তাঁর সামনে পাঁচজন সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে।

প্রতিভাকে রূঢ় একটা ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তারা ঘরে ঢুকল। তারপর ঠেলে তুলল বাবুরামকে বনিকে নির্দয় হাতে বিছানা থেকে তুলে একটা চাঁদরে পুঁটুলির মতো বেঁধে ঝুলিয়ে নিল। প্রতিভার কান্নাকাটি চিৎকারে কর্ণপাতও করল না। পিস্তল বুকে ঠেকিয়ে বলল, “চলো, তোমাদেরও যেতে হবে।”

বাবরামের ইচ্ছে করছিল নিজের গালে চড় কষাতে। এ বাড়িতে ওঠা যে কত বড় ভুল হয়েছে। এখন আর কিছুই করার নেই। তীরে এসে তরী ডুবল।

বাবুরাম শুধু চেষ্টা করলেন, পানচোকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু দেখলেন সেটা জায়গায় নেই।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁদের একটা প্রকাণ্ড গাড়ির ভিতরে তুলে গাড়ি ছেড়ে দিল গুণ্ডারা। বাবুরাম আর প্রতিভা নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

যখন তাঁরা পোর্টল্যাণ্ডে ঢুকলেন তখনও রোদ রয়েছে। চারদিকে আলো। শুধু প্রতিভা আর বাবুরামই চোখে অন্ধকার দেখছেন।

একটা নির্জন শহরতলির বনভূমি পেরিয়ে অনেকটা যাওয়ার পর এক বিশাল চত্বর জুড়ে চমৎকার একখানা ক্লিনিকের বাড়িঘর নজরে পড়ল। ভিতরে অজস্র বাগান, ফোয়ারা, ডিয়ার পার্ক, খেলার মাঠ। কয়েক মাইল নিয়ে ক্লিনিক।

গাড়ি একটা টিলার গায়ে চওড়া সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে গেল। সুড়ঙ্গটি আলোয়-আলোয় ছয়লাপ। যেখানে এসে গাড়ি থামল সেটি একটি ভূগর্ভের বাড়ি। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর এত আলোর ব্যবস্থা যে, বিশ্বাসই হতে চায় না এখানে এক নারকীয় পরিকল্পনার ষড়যন্ত্র আঁটা হচ্ছে।

লোকগুলো খুবই চটপটে। তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রায় ছাগল তাড়ানোর মতো ডিয়ে একটা ঘরে এনে ঢুকিয়ে দিল। বনিকে পুঁটলি করে কোথায় নিয়ে গেল কে জানে। প্রতিভা দৌড়ে গিয়ে দরজা টানাটানি করলেন, কিন্তু দরজা লক হয়ে গেছে।

বাবুরাম চারদিকে চেয়ে দেখলেন, এ-ঘরটি একটি জানালাহীন গর্ভগৃহ। যদিও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং আলো ঝলমল, তবু অনেকটা বন্দীনিবাসের মতোই মনে হচ্ছে।

প্রতিভা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "কী হবে এবার?"

বাবুরাম মাথা নেড়ে বললেন, "সব শেষ।"

প্রতিভা ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "বনিকে ওরা কি মেরে ফেলবে?"

"সেটাই সম্ভব প্রতিভা।"

"আর আমরা?"

"সান্ত্বনা এই যে, বনির পর আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখবে না।"

প্রতিভা কাঁদতে লাগলেন। বাবুরাম চোখ ঢেকে বসে রইলেন। কিছু করার নেই।

কতক্ষণ এভাবে কাটল কে জানে, হঠাৎ কোনও গুপ্ত মাইক্রোফোন থেকে কেউ বলল, মিস্টার এবং মিসেস গাঙ্গুলি, কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত, তবে আপনারা আমাদের মহা মূল্যবান গবেষণার তাৎপর্য না বুঝে বোকার মতো এমন অনেক কাজ করেছেন, যা সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকারক। বনিকে মারবার কোনও ইচ্ছে আমাদের ছিল না। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জেনে গেছেন যে, তার মগজের মাইক্রোচিপ ঠিকমতো সেট হয়নি। কোথায় গণ্ডগোল হল তা দেখার জন্য তার মগজ আমাদের তন্ন-তন্ন করে দেখতে হবে। কিন্তু তার মৃত্যু ভবিষ্যতে বৃহত্তর গবেষণায় প্রচুর সাহায্য করবে। বনির মৃত্যু মহান। আপনারা যদি অপারেশনটি দেখতে চান তা হলে দরজা খুলে বেরিয়ে বাঁ দিকে এগোলেই লিফট পাবেন। লিফট আপনাদের একটা অবজারভেশন গ্যালারিতে নিয়ে আসবে। সেখান থেকে সবই দেখতে পাবেন।

বাবুরাম চেঁচিয়ে বললেন, "আমাদের এখানে ধরে রেখেছেন কেন?"

"আপনারা বিপজ্জনক। দুঃখিত, আপনাদের রেহাই দেওয়ার কোনও উপায় নেই।"

প্রতিভা বাবুরামের হাত চেপে ধরে বললেন, "চলো, আমার ছেলেকে শেষবারের মতো দেখে আসি। আর তো ইহলোকে দেখা হবে না।"

বাবুরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চলো।"

এবার দরজা টানতেই খুলে গেল। করিডোর পেরিয়ে বাবুরাম আর প্রতিভা টলতে-টলতে লিফটে এসে উঠলেন। নিঃশব্দে লিফট তাদের নিয়ে এসে একটা ঘরে হাজির করল। অর্ধচন্দ্রের মতো সুন্দর ঘর। বাঁকা দেওয়ালটা পুরোপুরি স্বচ্ছ কাঁচে তৈরি। সেখানে বসবার জন্য আরামদায়ক সোফাসেট রয়েছে।

কাঁচের ভিতর দিয়ে মাত্র আট দশ ফুট নীচে দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা অপারেশন থিয়েটার। সেখানে হাজারো ছোটবড় যন্ত্রপাতি। কয়েকজন সাদা পোশাক পরা মুখ-ঢাকা

মানুষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। মাঝখানে অপারেশন টেবিলের ওপর বনি শুয়ে আছে।

প্রতিভা কাঁচের গায়ে কিল মারতে মারতে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন, "বনি! বনি! বনি! বনি!"

সেই চিৎকার অবশ্য পুরু প্লেক্সি গ্লাস ভেদ করে ও-পাশে যাবে না। তবে একটা গম্ভীর গলা মাইক্রোফোনে বলে উঠল, "চেঁচিয়ে লাভ নেই। চিন্তা করবেন না, বনির ব্যথা-বেদনার কোনও বোধ নেই। ওর মাথার খুলি খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে চিরে ফেলা হবে। এই দেখুন, লেসার যন্ত্র নিয়ে ডক্টর লিভিংস্টোন নিজেই কাজটা করছেন।"

প্রতিভা তবু পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন, "বনি! বনি! বনি!"

কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "ওই দেখুন, বনির চোখের রং কেমন পালটে সবুজ হয়ে গেল। আবার গাঢ় লাল। এই লক্ষণটাই বিপজ্জনক। তার মানে হল, বনির মগজের মাইক্রোচিপ যথাযথ কাজ করছে না। আমাদের কমপিউটার তরঙ্গ ঠিকমতো ধরতে পারছে না। ওকে যদি আদেশ দেওয়া হয়, তুমি তোমার বাবাকে খুন করো, ও হয়তো তা না করে বাবার গালে একটা চুমু খাবে। সেইজন্যই আমাদের দেখতে হবে, কোথায় আমাদের ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, কোথায় ভুল হচ্ছে। বিজ্ঞান চিরকালই এভাবে সত্যে পৌঁছেছে। বনি একটা সামান্য শিশু মাত্র..."

প্রতিভা কোনও কথাই শুনলেন না, পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন, "বনি! বনি! বনি!"

বাবুরাম প্রতিভাকে কিছুই বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

ওদিকে বনির চোখের মণি ক্রমশ রক্তাভা ধারণ করল। এত লাল যে, দূর থেকেও প্রতিভা ওর চোখের দুটি আলো ঝলমল করছে। দেখতে পেলেন।

লিভিংস্টোন নামক লোকটি ঝুঁকে পড়লেন বনির ওপর, হাতে একটি যন্ত্র।

হঠাৎ আলো নিবে গেল। চারদিকে এক পাথরের মতো নিরেট অন্ধকার।

প্রতিভা একটানা চিৎকার করে যাচ্ছিলেন, "বনি! বনি! বনি!"

সেই জমাট অন্ধকারে হঠাৎ পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে কার বেশ উত্তেজিত গলা শোনা গেল, "এটা কী হচ্ছে, ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে না কেন?"

কে যেন জবাব দিল, "টর্চ অবধি জ্বলছে না। তাজ্জব ব্যাপার।" আর-একজন বলে উঠল, "আমার লাইটারও জ্বলল না তো!"

সেই জমাট অন্ধকারে শুধু বনির দু'খানা রক্তচক্ষু দেখা যাচ্ছিল। আর কিছু নয়।

"বনি! আমার বনি! আমার বনি!" প্রতিভা কাঁচের গায়ে নিজের মাথা ঠুকছেন।

বাবুরাম নিঃশব্দে উঠলেন। আন্দাজে বাঁ দিকে দরজা লক্ষ করে এগিয়ে গেলেন। লিফট। উঠে দাঁড়াতেই লিফটটা নিঃশব্দে খানিকটা নেমে দাঁড়াল।

বাবরাম সোজা হেঁটে গিয়ে একটা দরজায় ধাক্কা খেলেন। হাতড়ে দরজার নব পেয়ে একটানে খুলে ফেললেন দরজা। ঘরটা একটা লাল আলোয় ভরে আছে। আবছা আলো। কিন্তু তাতে অপারেশন থিয়েটারটা চিনতে তাঁর দেরি হল না।

বনির টেবিলের ধারে কয়েকজন সাদা পোশাক-পরা মানুষ একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় আলোচনা করছে।

বাবুরাম সামান্য চেষ্টাতেই অপারেশনের যন্ত্রপাতি রাখার ট্রেটা দেখতে পেলেন। একটা সার্জিকাল ছোরা তুলে নিলেন হাতে। বনির চোখের আলো তাঁকে পথ দেখাচ্ছে।

নিঃশব্দে তিনি এগিয়ে গেলেন। ডক্টর লিভিংস্টোনকে চিনতে কষ্ট নেই। তাঁর হাতে এখনও লেসার গান। বাবুরাম তাঁর পিছনে গিয়ে সামান্য একটু দ্বিধা করলেন। আবার খুন!

কে যেন তাঁকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে সতর্ক করতে চেষ্টা করল ডক্টর লিভিংস্টোনকে। লিভিংস্টোন ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বাবুরাম ছোরাটা তুললেন।

কিন্তু শেষ অবধি ছোরাটা বসাতে পারতেন কি না তা নিয়ে বাবুরামের সন্দেহ আছে। শত অনিষ্টকারী শত্রু হলেও বাবুরাম কোনও মানুষকে এরকমভাবে মেরে ফেলতে হয়তো পারতেন না। ছোরাটা তুলেছিলেন বাবুরাম, তুলেই রইলেন। মারতে পারলেন না।

লিভিংস্টোন চট করে লেসার গান ফেলে পকেট থেকে চোখের পলকে একটা পিস্তল বের করলেন।

বাবুরাম বোকার মতো চেয়ে দেখলেন পিস্তলের নল সোজা তাঁর বুকের দিকে তাক করা।

ঠিক এই সময়ে একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল খুব কাছেই কোথাও। একটা আলোর ঝলকানি।

লিভিংস্টোন চমকে উঠে চেঁচালেন, "মাদার কমপিউটার! মাদার-কমপিউটার! সর্বনাশ! কে মাদার কমপিউটারের নাগাল পেল?"

বনির চোখের আলো নিবে গেল।

অন্ধকারে কে কারা যেন দৌড়াদৌড়ি করে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাবুরাম হঠাৎ

শুনতে পেলেন, একটি শিশুর কান্না। প্রচণ্ড কাঁদছে।

"বনি! বনি!" চেঁচিয়ে উঠলেন বাবুরাম। হাতড়ে-হাতড়ে টেবিলটার কাছে যেতেই তাঁর হাতে ঠেকল বনির হাত আর পা। বনি কাঁদতে কাঁদতে হাত-পা ছুঁড়ছে।

.

পর দিন কাগজে এবং টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে একটি খবর প্রচারিত হল। ডক্টর লিভিংস্টোনের ক্লিনিকে বিস্ফোরণজনিত অগ্নিকাণ্ডে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে লিভিংস্টোনও আছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে লিভিংস্টোনের ক্লিনিকে কিছু অবৈধ যন্ত্রপাতি এবং কনস্ট্রাকশন ছিল। সরকার থেকে এ-বিষয়ে আরও তদন্ত চালানো হবে.... .

সকালবেলায় বাবুরাম খুব মন দিয়ে কাগজ পড়লেন এবং টিভির খবর শুনলেন।

শোওয়ার ঘরে খাটের ওপর বনি হাত-পা ছুঁড়ে প্রবল বিক্রমে খেলা করছে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছেন প্রতিভা। বুকের ভার নেমে গেছে। তাঁর ক্লান্ত মুখে মায়ের গর্বের হাসি।

পনেরো দিন পরে ডক্টর ওয়াং হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করলেন, "গাঙ্গুলি, অভিনন্দন।"

"অভিনন্দন আমার প্রাপ্য নয় ডক্টর ওয়াং। প্রাপ্য চি চেং-এর। কিন্তু..."

ওয়াং দুঃখিতভাবে বললেন, "কী আর করা যাবে। চি চেং ওই সাজ্ঘাতিক আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তার কারণ সে নিজে ওই মাদার কমপিউটারে ঢুকে পড়েছিল। বেরোবার সময় পায়নি। তবে ভাববেন না, চি চেং-এর মতো অদ্ভুত-অদ্ভুত যন্ত্র আমি আবার বের করব। দুনিয়ার সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব। বিদায়। কালই জাপান যাচ্ছি।"

দিনটা বড় ভাল। বাবুরাম আর প্রতিভা প্যারামবুলেটরে বনিকে বসিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। এমন আনন্দের দিন বড় একটা আসেনি।

৭৭